স্থিত-প্রজ্ঞ দর্শন

বিনোবা

অনুবাদক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি ৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক

শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি ৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ১৯৫৮

২২০০

মূল্য

এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

মুদ্রক

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা ৯

प्रकाशक

भवानीप्रसाद चट्टोपाध्याय

सर्वोदय प्रकाशन समिति

सि ५२ कालेज स्ट्रीट मार्केट

कलकत्ता १२

पहला प्रकाश

नवम्बर १९५८

२२००

मूल्य

एक रुपया पचहत्तर नये पैसे

मुद्रक

प्रभातचन्द्र राय

श्रीगौरांग प्रेस प्राइवेट लि०

५ चिन्तामणि दास लेन

कलकत्ता ९

নিবেদন

স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যানগুলি উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সনের শীতকালে শিউনী জেলে ক্ষুদ্র এক বন্ধুমণ্ডলের সামনে দেওয়া হয়। ভারতের সর্বত্র হাজারো সত্যাগ্রহী নরনারী এই সব লক্ষণ সান্ধ্য-প্রার্থনায় ভক্তিভাবে নিত্য মনন করেন। তাঁদের জন্য এই ব্যাখ্যানগুলি পুস্তকাকারে উপস্থিত করা যাচ্ছে। পুস্তকের আকার দিতে গিয়ে শাস্ত্র-সন্তোষার্থ যতটা প্রয়োজন অদলবদল অবশ্যই করা হয়েছে।

স্থিত-প্রজ্ঞ লক্ষণে এক সমগ্র দর্শন নিহিত। তা খুলে ধরার প্রযত্ন এখানে করা হয়েছে। হয়ত এর কোন কোন অংশ প্রথম পাঠে বোঝা যাবে না। কিন্তু বার বার পাঠ ও চিন্তা করলে এবং যতটা বোঝা যাবে আচরণে ততটা করলে ধীরে ধীরে অনুভব দ্বারা সবটা স্পষ্ট হবে।

ত্রিশ বৎসরের নিদিধ্যাসনের ফলে যে অর্থ স্থির বলে বুঝেছি তা এখানে সমুপস্থিত করছি। এদিক-ওদিক ত কিছুটা হওয়ারই কথা। তবে তা থেকে বাঁচার উপায় সব কিছু ঈশ্বরার্পণ করে ছুটি নেওয়া। এই মনোভাব হতেই এই প্রকাশন।

পরং-ধাম, পবনার
তা. ১২. ৪. '৪৬

বিনোবা

'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' শাস্ত্রীয় পুস্তক। বুঝতে পাচ্ছি, সাধকেরা এ থেকে খুব সহায়তা লাভ করছেন। এই পুস্তক 'গীতা-প্রবচনের' পরে রচিত। 'গীতা-প্রবচন' যাঁরা পড়েছেন 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন'এর তাঁরা অধিকারী হয়েছেন। সাধক-মণ্ডলীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এর প্রচার দিন দিন বাড়ছে।

১৬.১০.৫৩-এর একখানি চিঠি থেকে

বিনোবা

অনুবাদক ডাক-পিয়ন। ডাক-পিয়ন প্রেরকের চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়। তার নিজের কিছু বলার নেই।

সুহৃৎ শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে ত্রুটি সংশোধনে অশেষ সহায়তা পেয়েছি। ত্রুটি যা কিছু অনুবাদকের। গুণ যা তা তাঁর।

বস্তুতঃ, বিশেষতঃ, স্বতঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ বাদ দিয়েছি। সুধীজন ক্ষমা করবেন।

অনুক্রমণিকা

দুই

এক

দুই

দুই

এক

দুই

তিন

ব্যাখ্যান—৭ পৃষ্ঠা ৫৭—৬৫

এক

ব্যাখ্যান—১২ | পৃষ্ঠা ১০০—১০৮

এক

১১৫ ইন্দ্রিয়ের অনুগামী মন বুদ্ধিকেও টেনে নেয়। অতএব সংযম চাই

১১৬ বুদ্ধি নৌকার মত তারক কিন্তু মনের প্যাঁচে পড়ে তাও হয় মারক

১১৭ বুদ্ধি ও মন বরাবরের মত আলাদা থাকতে পারে না। হয় বুদ্ধি মনের বশ হবে নয়ত মন বুদ্ধির বশ হবে। দ্বিতীয়টি শ্রেয়স্কর

দুই

১১৮ জ্ঞানদেবের বিশেষ সংকেত : জ্ঞানীদেরও অসাবধান হয়ে ইন্দ্রিয় সমূহকে অবাধে ছেড়ে দেওয়ার জো নাই

১১৯ বস্তুত জ্ঞানী নিয়মের বাঁধনে সংযমী থাকেন তা নয়। থাকেন স্বভাবে

১২০ জ্ঞানীর ত নয়ই, সাধকেরও সংযম বোঝা নয়

১২১ স্থিত-প্রজ্ঞের অসংযম অসম্ভব। কারণ স্থিরবুদ্ধির আধারই সংযম

১২২ সাবধানতা নিরপেক্ষ সহজাবস্থা মানুষের এক প্রকার আকাঙ্ক্ষা মাত্র। অতএব সাবধানতার সংকেত যে কোন অবস্থায় ঠিক

তিন

১২৩ এভাবে সংযমের আবশ্যকতা আদ্যন্ত সপ্রমাণ হল, তাই

ব্যাখ্যান—১৩ | পৃষ্ঠা ১০৯—১১৯

এক

১২৪ অন্তিম বিভাগ : স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতির স্পষ্টীকরণ।

১২৫ সারাংশের প্রথম সাংকেতিক শ্লোক। এর রাত ত তার দিন আর তার রাত ত এর দিন

দুই

ব্যাখ্যান—১৪ পৃষ্ঠা ১২০—১২৯

এক

১৪০ কাম শব্দের অর্থের বিচার-বিশ্লেষণ

১৪১ স্থিত-প্রজ্ঞ সর্ব কাম হজম করে ফেলে—এটা তার জ্ঞানের গরিমা

দুই

১৪২ জ্ঞানের গৌরব ও জ্ঞানের স্বরূপ এই দুইয়ের মাঝখানে তার নীতিসূত্র রয়েছে

১৪৩ মধ্যখানে মানে কি? তা তৎতৎ কালের সমাজের স্থিতির ওপর নির্ভর করবে

১৪৪ জ্ঞানীদের নীতিসূত্র সম্বন্ধে ভ্রান্তিক কল্পনা হানিকর

তিন

১৪৫ এই শ্লোককে দেখার আর এক দৃষ্টি। ভাবাবস্থায় স্থিত-প্রজ্ঞ সব শুভ দেখে

১৪৬ শুভ+অশুভ=শুভ। কেন না, অশুভ=০

১৪৭ অশুভ মিথ্যা, সাধনা মিথ্যা, অশুভের মরণ মিথ্যা, শুভই কেবল সত্য—একে বলে ভাবাবস্থা

ব্যাখ্যান—১৫ পৃষ্ঠা ১৩০—১৪০

এক

১৪৮ স্থিত-প্রজ্ঞ লক্ষণের উপসংহার। স্থিত-প্রজ্ঞের কোন কামনা নাই, জিজীবিষা নাই

১৪৯ মুমূর্ষাও নয়, মরণের ভীতিও নয়

১৫০ জীবনের অভিলাষই বাস্তবিক মরণের ভীতি। তা দূর হয়ে গেলে জীবন আনন্দময় হয়

১৫১ 'চরতি' পদ দ্বারা একথাই সূচিত হয়েছে

দুই

তিন

ব্যাখ্যান—১৭ পৃষ্ঠা ১৫২—১৬২

এক

দুই

তিন

এক

দুই

তিন

স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন

প্রথম ব্যাখ্যান

এক

১. গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের বিশেষ স্থান

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ গীতার অতিশয় প্রসিদ্ধ বিষয়। সেই প্রাচীন যুগ হতে আজ অবধি গীতার প্রায় অপর কোন অংশ এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। কারণও আছে। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ পুরুষ-বিশেষ। ঐ শব্দটি গীতার নিজস্ব। গীতার পূর্ববর্তী গ্রন্থে তা পাওয়া যায় না। গীতার পরেকার গ্রন্থে খুব দেখা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় গীতায় আদর্শ পুরুষের আরও বর্ণনা আছে। কর্মযোগী, জীবন্মুক্ত, যোগারূঢ়, ভগবদ্‌ভক্ত, গুণাতীত, জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যাদি নানা আদর্শ-চিত্র বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জায়গায় আছে। কিন্তু এইসব আদর্শ অপর অনেকেও উপস্থিত করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন সাধনার আলোচনা প্রসঙ্গে এইসব আদর্শ গীতায় উপস্থিত করা হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ থেকে তাঁরা কিছু আলাদা পুরুষ, তা নয়। সে সব স্থিতপ্রজ্ঞেরই বিবিধ দিক। ঐ সবের বর্ণনায় গীতা প্রায় সর্বত্র স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ গ্রথিত করেছে। যথা—পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাসী অথবা যোগী পুরুষের বর্ণনায় 'স্থির-বুদ্ধি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্ত-লক্ষণের পরিসমাপ্তি 'স্থিরমতি' শব্দ দিয়ে করা হয়েছে। বুদ্ধির

স্থিরতা লাভ না হলে কোন আদর্শ ই পুরা হয় না। তাই এই প্রকরণকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। জীবন্মুক্তির সিদ্ধির প্রমাণ দিতে গিয়ে ভাষ্যকার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ উপস্থিত করেছেন। সাধকের দৃষ্টিতে অন্তিম আদর্শের, ধৈর্য্যমূর্তির এইটিই একমাত্র সবিস্তার আলোচনা।

২. পূর্ব-ভূমিকা—সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বুঝতে হলে তার আগেকার ভূমিকা বিচার করে দেখা আবশ্যক। এই প্রকরণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তে অবস্থিত। এর আগে দুই বিষয়ের বিচার করা হয়েছে—(১) সাংখ্য-বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কিংবা ব্রহ্মবিদ্যার শাস্ত্র আর (২) যোগবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অনুযায়ী জীবনকলা। শাস্ত্র ও কলার সংযোগে ব্রহ্মবিদ্যা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। যে কোন বিদ্যা সম্পর্কে একথা খাটে। সঙ্গীত-বিদ্যার কথা ধরুন। সঙ্গীত-শাস্ত্র কেউ শিখেছে, কিন্তু কণ্ঠ থেকে সঙ্গীত ব্যঞ্জনার কলা যদি না সেধে থাকে ত সে সঙ্গীত কোন কাজে আসবে? এর উল্টো, কণ্ঠে কলা আছে কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান নেই। সে স্থলে প্রগতির পথ রুদ্ধ। অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা, তথা, মনুষ্য জীবন সম্বন্ধেও। মানুষের তত্ত্বজ্ঞান তার বুদ্ধিতে গুপ্ত থাকবে। প্রকাশ পাবে তার আচরণ। আচরণ থেকে তার তত্ত্বজ্ঞানের পরিমাপ সংসার পাবে আর সে নিজেও পাবে। আচরণ ও জ্ঞানে ব্যবধান থাকে ত থাক, কিন্তু বিরোধ যেন কোন মতেই না থাকে। আর ব্যবধানও সতত ঘুচাতে হবে। এ কাজ যোগবুদ্ধির। তুলসীদাস সাধুদের তুলনা করেছেন ত্রিবেণীর সঙ্গে। ভক্তিকে বলেছেন গঙ্গা, আর কর্মযোগকে যমুনা, আর ব্রহ্মবিদ্যার তুলনা করেছেন গুপ্ত সরস্বতীর সঙ্গে। ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপত সদা অপ্রকটই থাকবে, একথাই এই উপমাতে বলা হয়েছে। যোগবুদ্ধি তাকে প্রকট করবে। যোগবুদ্ধি

সাধককে প্রত্যক্ষ পথপ্রদর্শন করে। সাংখ্যবুদ্ধিই যোগবুদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। ভিত্তি ছাড়া ঘর তৈরি হয় না, ঘর ছাড়া ভিত্তি অকেজো। দেশলাইতে আগুন অব্যক্তরূপে থাকে। কাঠ ঘষেছেন ত ব্যক্ত হয়। অব্যক্ত বিজলীর কার্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছেই মাত্র ধরা পড়ে। ব্যক্ত হলে তার শক্তির পরিচয় যে কেউ পায়। সাংখ্য-বুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধির পারস্পরিক সম্বন্ধ এরূপই বটে।

৩. যোগ-বুদ্ধির অন্তিম গন্তব্য—স্থির সমাধি অর্থাৎ স্থিত-প্রজ্ঞতা

যোগ-বুদ্ধির প্রথম স্বরূপ কর্তব্য-নিশ্চয়। কর্তব্য নিশ্চয় না হলে সাধনা আরম্ভ হয় না। নিশ্চয়ের পরে একাগ্রতা অর্থাৎ সাধনায় তন্ময়তা। দ্বিতীয় ধাপে আসে ফলের দিকে না তাকিয়ে সাধনায় ডুবে যাওয়ার বৃত্তি, সাধনৈকশরণতা, কিংবা সাধন-নিষ্ঠা। তার পরের ধাপ হচ্ছে চিত্তের নির্বিকার দশা কিংবা সমতা অর্থাৎ সমাধি। তা যখন স্থির হয়, অচল হয়, কোন ধাক্কাতেই টলে না, তখন স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা লাভ হয়। যে বিকার-মাত্রের, বিচারমাত্রের, এমন কি বেদবচনের প্রভাবেরও উর্ধ্বে উঠেছে, যার সমাধি অচল হয়েছে, স্থির হয়েছে সে স্থিতপ্রজ্ঞ। যোগ-বুদ্ধি এভাবে চার ধাপে বিভক্ত—(১) সাধন-নিশ্চয়, (২) ফল-নিরপেক্ষ একাগ্রতা, (৩) সমতা বা সমাধি ও (৪) স্থির সমাধি—অখণ্ড, নিশ্চল ও সহজ। এরই নাম স্থিতপ্রজ্ঞাবস্থা।

৪. তদ্‌বিষয়ক জিজ্ঞাসা

যোগ-বুদ্ধির অন্তিম পরিপাক সমাধিতে, স্থিতপ্রজ্ঞতায়—ভগবানের এই বিশ্লেষণ থেকে অর্জুন প্রশ্নবীজ পেলেন, আর সেই সব কথা অবলম্বন

করেই, সমাধিতে স্থির-নিশ্চল স্থিতপ্রজ্ঞ কিভাবে থাকেন, তা জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করলেন। এরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? সে কিভাবে বলে, কি ভাবে থাকে, কিভাবে চলে এ সব আমায় বলুন, একথা তিনি বললেন। তার উত্তরে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেছেন। আর তাই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়।

দুই

৫. সমাধি দ্বিবিধঃ বৃত্তিরূপ ও স্থিতিরূপ

ভগবানের বক্তব্য বিবেচনা করার আগে এখানে সমাধি শব্দটি ভাল করে বুঝে নেওয়া চাই। কারণ, শব্দটি বড়ই গোলমেলে। সমাধি মানে ধ্যান-সমাধি, সাধারণত এরূপ অর্থ করা হয়। অমুকে সমাধিতে আছে—এর মানে যদি এই হয় যে চিন্তা ত সে করছেই, তা বাদে অন্য কোন সংবেদনা তার নাই, তা হলে সমাধিস্থ পুরুষ কিভাবে বলে, কিভাবে চলে অর্জুনের এই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে যায়! এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে কোন কোন টীকাকার স্থিতপ্রজ্ঞ-দশাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিকালে কিভাবে চলেন আর (২) সমাধি ভিন্ন অন্য সময়েই বা কিভাবে চলেন, এরূপ দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। কল্পনার চাতুর্য এই বিশ্লেষণে আছে। কিন্তু বিচার-দোষও এতে আছে। গীতার এই স্থানে উক্ত সমাধি যে ভিন্ন প্রকারের সেকথা হিসাব করা হয় নাই। যে সমাধি লাগে ও ভাঙ্গে তা ধ্যান-সমাধি। স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি তা থেকে ভিন্ন। তা হল জ্ঞান-সমাধি। তা লাগেও না, ভাঙ্গেও না। “নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি” এই কথায় তার বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তা হল স্থিতি। বৃত্তি নয়। ধ্যান-সমাধি বৃত্তি। চার

চার দিন টিকলেও তা ভাঙ্গবে এই প্রত্যাশা আছে। এই সমাধি তদ্রূপ নয়।

৬. স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি বৃত্তি নয়

স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি বৃত্তি নয়। তা নিবৃত্তি। নিবৃত্তি শব্দে লোকে আঁতকে ওঠে। তারা বলে, "এ ত চুপচাপ বসে যাওয়া"। কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। মৌন বসা, সেও এক বৃত্তিই বটে। স্থিতপ্রজ্ঞে এ বৃত্তি নাই। স্থিতপ্রজ্ঞ সর্বভাবে নিবৃত্ত। তার মানে এই নয় যে সে ধ্যান করবে না। সেবা কার্যের জন্য চিন্তন দরকার হলে অথবা অবসর সময়ে কিছু কাল ধ্যানাদি ত করবে। কিন্তু তা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নয়। স্থির-বুদ্ধি তার লক্ষণ। কর্মযোগ যেমন এক আবশ্যক সাধন, ধ্যানও তেমন আবশ্যক সাধন। কিন্তু কর্মযোগেরই মত ধ্যানও স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতি নয়।

৭. এ বিষয়ে গীতা ও যোগ-সূত্র এক মত

পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্রের কারণে সমাধি শব্দের অর্থ ধ্যান-সমাধি বলে গণ্য হয়ে গেছে। কিন্তু পতঞ্জলিও ধ্যান-সমাধিকে অন্তিম স্থিতি বলেন নাই। পতঞ্জলির সূত্র সুব্যবস্থিত ও অনুভবসিদ্ধ শাস্ত্র। ১৯৫টি সূত্র তাতে আছে। প্রথম তিন সূত্র সারভূত। ব্রহ্ম-সূত্রে যেমন চতুঃসূত্রী, যোগ-সূত্রে তেমন এই ত্রিসূত্রী: (১) অথ যোগানুশাসনম্ (২) যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ (৩) তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। এই তিন সূত্রে সারা শাস্ত্র গুটিকয়েক কথায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এতে সমাধির ত নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। প্রাপ্তব্য হচ্ছে যোগ আর চিত্তবৃত্তি-নিরোধ তার ব্যাখ্যা। সমাধি অর্থাৎ ধ্যান-সমাধিও এক বৃত্তিই বটে। তাই তার

উপযোগকে বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ লাভের পক্ষে পতঞ্জলি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলে গণ্য করেছেন। 'শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা-পূর্বকঃ' যোগারোহণের এইসব ধাপ তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রারম্ভে শ্রদ্ধা, তা থেকে বীর্য অর্থাৎ উৎসাহ, তৎপূর্বক (তাকে পূর্বে রেখে) স্মৃতি অর্থাৎ আত্মস্মরণ, তৎপরিপাক (তার পরিপাকের জন্য) তন্ময়তারূপ ধ্যানসমাধি, তা হতে প্রজ্ঞা—আর প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে ত হল যোগ। এই ভাবে ধাপে ধাপে যোগলাভ হয় একথা তিনি স্পষ্ট বলেছেন। অর্থাৎ যোগপ্রাপ্তির পক্ষে সমাধির পরে প্রজ্ঞার কথা তিনি বলেছেন। এই প্রজ্ঞা শব্দ গীতা থেকেই পতঞ্জলি নিয়েছেন। অর্জুনের প্রশ্নের ঠিক পূর্ব শ্লোকে ভগবান বলছেন, তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হবে তখন তোমার যোগ-প্রাপ্তি ঘটবে। যোগ-ই পতঞ্জলির অন্তিম শব্দ। প্রজ্ঞা তার সাধন আর প্রজ্ঞা-লাভের সাধন সমাধি একথা তিনি বলেছেন। সমাধির ধ্যান-স্বরূপ চলে গিয়ে অনুক্ষণের সহজ স্থিতির স্বরূপ তাতে আসে। এ-ভাবে পতঞ্জলির সূত্রে ও গীতার বিশ্লেষণে সমন্বয় রয়েছে।

তিন

৮. 'স্থিত' প্রজ্ঞে কম্প নাই, বক্রতা নাই

স্থিতপ্রজ্ঞের কল্পনায় বুদ্ধিবাদের পরাকাষ্ঠা হয়েছে। বুদ্ধি, শুদ্ধবুদ্ধি বোধের সাধন বলে গণ্য হয়েছে। রাগদ্বেষাদি বিকার হতে অলিপ্ত বুদ্ধিই জ্ঞানের যথার্থ সাধন হতে পারে। আমরা বলে থাকি, অমুক কথা আমার বুদ্ধিগম্য নয়। গীতা বলে, 'আমার বুদ্ধি' বলো না। 'আমার' বিশেষণ ফেলে দিয়ে নিছক শুদ্ধ বুদ্ধি কি বলে তা দেখ। আমিত্বে অহংকার আছে, বিকার আছে। সংসারের গোলামি আছে, পরিস্থিতির

বন্ধন আছে। তুমি মন্দ-বুদ্ধিবাদী কি বুদ্ধিবাদী? বুদ্ধি যখন বিকার-রহিত হয়, সব ঝঞ্ঝাট হতে আলগোছ হয়, তখন তা স্থিত হয়। স্থিত হয় মানে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। হেলে না, দোলে না। কম্প তাতে থাকে না। 'সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে', তার নিষ্কম্প যোগ লাভ হয়, এই যে কথা পরে দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তার অর্থ এই। বুদ্ধিতে কম্পের বা হেলা-দোলার, ইতস্ততের, অসোয়াস্তির, অনিশ্চয়তার লেশও যেন না থাকে। তবেই সে বুদ্ধি কাজ দেবে, আর তবেই তাকে বুদ্ধি বলা যাবে। স্থিত শব্দের অপর অর্থ সরল। বুদ্ধি একেবারে সরল হওয়া চাই। তাতে লেশমাত্র বক্রতাও থাকবে না। চরকার টেকোর কথা ধরুন। এতটুকু বাঁকা হলে মিহি সুতা কাটা যায় না। একদম সিধা, সরল হলেই তা কাজ দেয়। বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। চরকার সরল টেকো স্থিতপ্রজ্ঞের বুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপমা। সরল টেকোকে ইংরেজিতে ট্রু বলা হয়। শব্দটিতে অতীব বিশেষত্ব আছে। বক্রতার লেশও নেই এমন টেকোকে ট্রু অর্থাৎ নিখুঁত বলা হয়। তদ্রূপ, বুদ্ধিও ট্রু অর্থাৎ অচুক হওয়া চাই।

৯. কম্প ও বক্রতার আরও বিশ্লেষণ

কম্প ও বক্রতা এই দুই দোষের পার্থক্য একটু দেখে নেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত এই দুইয়ে মিলে একই দোষ। চরকার টেকো হতে একথা বোঝা যাবে। যে টেকো টেরা তা কাঁপে। বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। সরল সিধা বুদ্ধি কখনও কাঁপে না। এই দৃষ্টিতে কম্প ও বক্রতা একরূপ হল, তবু বিচারের দৃষ্টিতে এই দুইয়ের অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নেওয়া ভাল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন ত দেখা যাবে যে কম্প মুখ্যত বুদ্ধির দোষ, আর বক্রতা মনের দোষ। এক দিক থেকে মন

বুদ্ধিরই অংশ। তা হলেও বিচারকালে তাকে বুদ্ধি থেকে আলাদা করে নিতে হয়। শিশুদের মন একদম সরল। তাই ঝট্ করে তারা জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে। অতএব জ্ঞান-দৃষ্টির দিক থেকে ঋজুতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুণ মনে করতে হবে। ঋজুতা ছাড়া নিশ্চিত ও নিষ্কম্প জ্ঞান লাভ হওয়ার নয়। অর্জুন শব্দের অর্থই আসলে 'ঋজুবুদ্ধিসম্পন্ন'।

১০. বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ভেদ

গীতার প্রজ্ঞা শব্দ বিশেষ অর্থের দ্যোতক। বুদ্ধি শব্দ সাধারণ। মনোবিকার অনুসারে বুদ্ধি বদলায়। মানুষের মানসিক কল্পনার ছোপে তার বুদ্ধি ছুপিয়ে যায়। এই রঙ্গীন বুদ্ধি নির্ভুল নির্ণয় দিতে অসমর্থ। যে বুদ্ধি নানা চিন্তার, বিকারের, পছন্দ না-পছন্দের, নানা বৃত্তির রঙ্গে রঙ্গিয়ে যায় না, যে বুদ্ধি কেবল জ্ঞানের কার্য করে তা হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা তটস্থ। বুদ্ধিতে রঙের ছোপ লাগে ত এক বুদ্ধি অনেক বুদ্ধি হয়ে যায়। দয়ার ছোপ লাগে ত দয়াবুদ্ধি, দ্বেষের ছোপ ত দ্বেষবুদ্ধি। এরূপ বহু বুদ্ধি মানুষকে বহু দিকে টলাতে থাকে, হয়রান করতে, ব্যাকুল করতে, দিশেহারা করতে থাকে। এরূপ হাজার-বুদ্ধি পথপ্রদর্শন করতে অক্ষম। শুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাই অভ্রান্ত নির্ণয় দেয়। কারণ, তার নিজের কোন রঙ নেই। তা থারমোমিটরের মত। থারমোমিটরের নিজের জ্বর হয় না। তাই অন্যের তাপ তা মাপতে পারে।

১১. শরীর-শক্তি হতে বুদ্ধিশক্তির বিশেষতা

বুদ্ধি কারো কম, কারো বেশী। গুরুত্ব কমবেশীর নয়। গুরুত্ব স্বচ্ছ বুদ্ধির। হোক না আগুনের ফুলকি ক্ষুদ্র, তবু তা কার্যকরী হতে পারে। রাশীকৃত তুলা তা ভস্মসাৎ করতে পারে। তার উল্টো, মস্ত বড় কয়লার

ঢেলা রাখুন, তা তুলায় বসে যাবে। "প্রশ্ন" কমবেশী বুদ্ধির নয়। শুদ্ধ বুদ্ধির এক ছোট ফুলকি, ক্ষুদ্র এক শিখা, বস্, যথেষ্ট। এখানেই বুদ্ধির শক্তির বিশেষত্ব। শারীরিক শক্তির তদ্রূপ নয়। কোন ছিপছিপে পালোয়ান এই জন্মে গামা হতে পারবে কি পারবে না সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। অল্পবুদ্ধি কোন লোকের পক্ষে দেশশাসনের উপযোগী নেতৃত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথায় সংশয় নাই যে এই জন্মে স্থিতপ্রজ্ঞ হওযার শক্তি একান্ত অল্প-বুদ্ধি ও অশিক্ষিত লোকের আছে। তার জন্য বুদ্ধির দরকার নেই। দিগ্গজ বুদ্ধি জগতে বিরাট ব্যবসা ফাঁদতে পারে আর যেমন খুশি ওলট-পালটও করতে পারে কিন্তু ত্রিভুবন ভস্মসাৎ করার সামর্থ্য কেবল প্রজ্ঞার স্ফুলিঙ্গেই আছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান

এক

১২. সমাধির আরও একটু আলোচনা

অর্জুনের প্রশ্ন আমরা দেখেছি। প্রজ্ঞা কাকে বলে, সমাধি কি, সে বিচারও করা হয়েছে। প্রজ্ঞা সাধারণ বুদ্ধি নয়; নির্ণয়ের দিকে যার নিরন্তর গতি সেই বুদ্ধি। এই প্রজ্ঞা 'স্থিত' অর্থাৎ সোজা খাড়া থাকা চাই। সোজা খাড়া মানে নিশ্চিন্ত ও সরল।' 'সমাধি' মানে ধ্যান-সমাধি যে নয় তাও আমরা দেখেছি। 'সমাধি' শব্দের আরও একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। 'সমাধি' শব্দে 'সম্' ও 'আ' উপসর্গ এবং 'ধা' ধাতু রয়েছে। সমাধান শব্দেরও ব্যুৎপত্তি এই। চিত্তের সমাধানের স্থিতি মানে সমাধি। সমাধান মানে সমতুল্যতা। দাঁড়ির দুই পাল্লা একেবারে সমান হলে বলা হয় সমতুল হয়েছে, দাঁড়ির সমাধান হয়েছে। চিত্তের স্থিতি তুলাদণ্ডের মত সমতুল, অচল ও শান্ত হলে বলা হয় তার সমাধান হয়েছে। এই সমাধি অনুক্ষণ স্থায়ী। কখনও তা ভঙ্গ হয় না। পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই স্থিতির তুলনা করা হয়েছে বায়ুশূন্য স্থানের কম্পনহীন দীপ-শিখার সঙ্গে। একেই দীপ-নির্বাণ বলে। দীপ-নির্বাণ শব্দের অর্থ 'নিষ্কম্প দীপের মত একভাবে জ্বলতে থাকা' করতে হবে। 'দীপ নিভে যাওয়া' এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে না। নিভে যাওয়ার পরেকার শান্তি শরীর থাকতে লাভ করা যায় না। সমাধি মানে চিত্তের সেই শান্ত স্থিতি যা এই দেহেই অনুভব করা যায় আর যা ছেদবিহীন।

এই প্রশ্নের সমাধি শব্দ থেকেই এভাবে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর সূচিত হচ্ছে। সে কথাই ভগবান এখন একটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করে বলছেন।

১৩. স্থিত-প্রজ্ঞের সমাধির নিষেধক ও বিধায়ক মিলে পূর্ণ ব্যাখ্যা

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

এখানে সমাধির শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। 'উচ্যতে' শব্দ এখানে ব্যাখ্যার দ্যোতক এটা বুঝতে হবে। এই শ্লোকে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা সমুচিত ও পরিপূর্ণ। অর্থাৎ তার স্বরূপ দ্বিবিধ—সমর্পক* ও বিধায়ক। এরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করলেই তা পূর্ণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'অহিংসা' শব্দ নিন। 'হিংসা করো না' এই হচ্ছে তার নিষেধক অর্থ। 'ভাল বাস' এ হচ্ছে বিধায়ক অর্থ। দুইয়ে মিলে অহিংসার ব্যাখ্যা পূর্ণ হবে। 'প্রজহাতি যদা কামান্' এটি নিষেধক লক্ষণ আর 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ' এটি হচ্ছে তার বিধায়ক স্বরূপ। এই উভয়বিধ লক্ষণ নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম ভাষায় বলা হয়েছে।

১৪. নিষেধক ব্যাখ্যা ঃ নিঃশেষে কামনা-ত্যাগ

"মনের সর্ব কামনা ছাড়া"-রূপ নিষেধাত্মক লক্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে। মন নানা কামনার পুঁটলি। তার অর্থ তেমন মন থাকতে নাই। আমার হাতের উপর হঠাৎ কোন জ্যোতিষীর নজর পড়ে। তিনি বলেছিলেন, "দেখা যাচ্ছে তোমার হাতে হৃদয়ের রেখাই নেই।"

* শব্দটি মারাঠী। অর্থ সমুচিত।

তার উত্তরে বলেছিলাম, "তা হলে ত আমার ভগবান লাভ হয়েছে।" আমি মনে করি মানুষের কেবল বুদ্ধিই থাকা উচিত, মন না থাকাই ভাল। বুদ্ধিতে তার লীন হওয়া চাই। মন মানে সংকল্প-বিকল্প। মন নয় ত কামনার গাঁটরি। সংকল্প-বিকল্প কিংবা কামনা এসবের বুদ্ধির আজ্ঞাধীনে চলা চাই। মন ও বুদ্ধিতে যেন আড়াআড়ি, রেষারেষি না চলে। বুদ্ধি বলবে, মন করবে। নির্ণয়ের কাজ বুদ্ধির। বুদ্ধি আইন-প্রণয়নকারী বিভাগ। মন তালিমকারী বিভাগ। বুদ্ধির ক্ষেত্রে আদপে সে নাক ঢোকাতে যাবে না। যে যার কাজ করবে। নাড়ু মিঠে কি তেতো, খাওয়ার যোগ্য কি অযোগ্য, জিভ এটুকুমাত্র দেখবে। কতটা নাড়ু খাওয়া হবে তা ঠিক করা তার কাজ নয়। তাতে নাহক নাক গলাতে যেন সে না যায়। মনকে এভাবে বুদ্ধির অনুসরণ করে চলতে হবে। আস্তে আস্তে বুদ্ধিতে তার লীন হয়ে যেতে হবে। মনরূপী গাঁটরি থেকে এক এক টুকরা করে নেকড়া বার করে নেয় ত গেল গাঁটরি। অর্থাৎ মন তখন জীর্ণ হয়েছে, মিলিয়ে গেছে, শান্ত হয়েছে, বুদ্ধির সঙ্গে একরূপ হয়ে গেছে। একে বলে যথার্থ মনোনাশ। মনোনাশ মানে মনের শক্তির নাশ নয়। মনোনাশের অর্থ মন বুদ্ধির অনুগামী হবে। বিনা তর্কে বুদ্ধির নির্ণয় অনুসারে কাজ করবে। মনের কর্মশক্তি নাশ করার কথাই ওঠে না। সে শক্তি সদা অক্ষয় রাখতে হবে। হাঁ, তবে মনের কামনামাত্র সমূলে নাশ করতে হবে। এভাবে মনের সব কিছু কামনার পরিপূর্ণ ত্যাগ করা হচ্ছে স্থিত-প্রজ্ঞের ব্যাখ্যার নিষেধাত্মক অঙ্গ।

১৫. বিধায়ক ব্যাখ্যা : আত্ম-দর্শন

এখন ব্যাখ্যার বিধায়ক অঙ্গের বিচার করা যাক। "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ" সেই বিধায়ক লক্ষণ। স্থিত-প্রজ্ঞ আত্মাতেই সন্তুষ্ট। বাইরের ছবি অপেক্ষা ভিতরের দৃশ্যে সে তৃপ্ত। বস্তুত বাহ্যদৃশ্য অপেক্ষা অন্তরের দর্শনই অধিক সুন্দর, অধিক মহান। কাব্যে কবি যে দৃশ্যের বর্ণনা করে প্রত্যক্ষ দৃশ্য অপেক্ষা তার ঐ বর্ণনা অধিক মধুর। তার কারণ এই যে তার ঐ ধ্যেয়বাদময় অন্তর-সৃষ্টি বাহ্য সৃষ্টি অপেক্ষা রমণীয়। সেই রমণীয় আত্ম-দর্শনের কথা এই বিধায়ক লক্ষণে বলা হয়েছে। এই দুই লক্ষণ মিলে স্থিত-প্রজ্ঞের দর্শন (ছবি) পূর্ণ হয়। কামনা সে ত্যাগ করে আর সন্তোষের ধারা ত তার অন্তরে বইছেই। কামনাতে আনন্দ নাই একথা তার চিত্তে গেঁথে গেছে। আর সত্যসত্যই কামনাতে আনন্দ বা সন্তোষ আছে কিনা তা বিচার করে দেখার মত। কামনা থেকে শান্তি, শীতলতা, সন্তোষ মেলে অনুভব একথা বলে না। উল্টো, কামনার দরুন মন সতত টলমল করতে থাকে। টলমলতা মানুষকে ব্যাকুল করে। টলমলতা আগুন জ্বালায়। অতএব কামনা গেলে শীতলতা (তুষ্টি) কমে যাবে এরূপ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। কামনা হতে সন্তোষ মেলে এরূপ মনে হয় বটে, আসলে তা নয়। আনন্দ আসে কামনার তৃপ্তি অর্থাৎ কামনার অভাব থেকে। কামনা পূর্ণ হওয়া মানে একপ্রকারে তা শান্ত হওয়া, নাশ হওয়া। বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে আনন্দের স্থান কামনা নয়, কামনা হতে মুক্তিতেই আনন্দ। সেজন্য এখানে দ্বিবিধ লক্ষণে বলা হয়েছে যে সন্তোষ কামনার পূর্ণ ত্যাগে, সন্তোষ আত্মাতেই অর্থাৎ নিজস্বরূপে।

১৬. আত্ম-দর্শন ও কামনা-ত্যাগ একে অন্যের কার্যকারণ

এখানে যে দ্বিবিধ লক্ষণের কথা বলা হল তা যে কেবল বিধায়ক ও নিষেধক, তা নয়। তা থেকে অন্য দুই প্রকারের অর্থও পাওয়া যায়। এদের প্রথমটি স্বরূপত প্রারম্ভিক ও দ্বিতীয়টি প্রগত, এরূপও বলা যেতে পারে। প্রথমটি সাধনরূপ—সকল কামনা ত্যাগ করতে তা বলে। দ্বিতীয়টি, কামনাত্যাগ হতে প্রাপ্ত স্থিতির দ্যোতক। অতএব প্রথমটি সাধনরূপ প্রাথমিক, দ্বিতীয়টি তার ফলিতরূপ (পরিণতিরূপ) প্রগত। "বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্"—ভিতরে আনন্দের কি যে খনি, বাহ্য বিষয় হতে আলগা হলে তা বোঝা যায়, এই বাক্য দ্বারা গীতা সেই ক্রম নির্দেশ করেছে। এর উল্টো, পরে স্থিত-প্রজ্ঞ লক্ষণেই একথাও বলা হয়েছে যে যেমন-যেমন আত্মদর্শন হতে থাকে তেমন-তেমন কামনার রস শুখাতে থাকে। তার মানে, একথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে আত্ম-দর্শন সাধন আর কামনা-নাশ তার ফল। এই দৃষ্টি থেকে "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ"-কে মূলীভূত লক্ষণ বলে মানতে হবে। আত্ম-তৃপ্তি দেখা যায় না। কামনা-ত্যাগ চোখে পড়ে। অমুক লোকের মধ্যে কামনা দেখা যায় না, এই হচ্ছে তার প্রকট লক্ষণ। আত্মসন্তোষের তা নিদর্শন ও পরিণাম। অতএব তাকে ফল-স্বরূপ বলা যাবে। কিন্তু প্রথমে আত্মদর্শন, কি প্রথমে কামনা-ত্যাগ এরূপ তর্ক করাই ব্যর্থ। এ যেন প্রথমে বীজ কি প্রথমে বৃক্ষ এরূপ তর্ক। আত্মদর্শন ও কামনা-ত্যাগ একে অন্যের কার্য-কারণ।

দুই

১৭. কামনা-ত্যাগের চার প্রক্রিয়া

কামনামাত্রের নিঃশেষ ত্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কামনাকে কাঁটা বলে গণনা করা হয়েছে। সোনার হলেও কাঁটা বেঁধেই। সোনার ছুরিতেও প্রাণ-নাশ ঘটে। তাই ত গীতার সিদ্ধান্ত এই যে সকল কামনা দূর করে দিতে হবে। কিন্তু গীতারই নজির দেখিয়ে বলা হয় যে কোন কোন কামনা রাখতে গীতার আপত্তি নাই। প্রমাণস্বরূপ, "ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ" এই বচন উদ্ধৃত করা হয়। তাই এই প্রশ্নের বিচার করা দরকার। এই দুই বচনে বস্তুত কোনই বিরোধ নাই। এক বাক্যে রয়েছে, যে গন্তব্যে পৌঁছতে চাই সেই গন্তব্যের নির্দেশ। অপর বাক্যে দেখানো হয়েছে, কামনা নাশ কি প্রকারে করা যায় সে পথ। কামনা-নাশের প্রক্রিয়া সাধারণ ভাবে চার: (১) ব্যাপক প্রক্রিয়া (২) একাগ্র প্রক্রিয়া (৩) সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া (৪) বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া।

১৮. কর্মযোগের ব্যাপক প্রক্রিয়া

(১) ব্যাপক প্রক্রিয়া। কামনা বস্তুটা ব্যক্তিগত। তাকে সামাজিক রূপ দেওয়া কর্মযোগে কামনা-নাশের এক উপায়। মনে করুন গ্রামের কোন লোক তার ছেলেকে পড়াতে চায়। সে গ্রামে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে, নিজের ছেলের লেখা-পড়ার সাথে সাথে অন্য ছেলেদের পড়ার সুবিধা করে দিতে পারে। এভাবে নিজের কামনাকে সামাজিক রূপ দেওয়া যায়। প্রাচীন যুগের একটি উদাহরণ দিই। কারো মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হলে তাকে বলা হত মাংস যদি খাবেই ত যজ্ঞের রূপ

দিয়ে খাও। যজ্ঞ কর মানে অন্যকে খাইয়ে যজ্ঞশিষ্ট খাও। মেয়েরা ঘরে এরূপই করে। পিঠা-পায়স খাওয়ার ইচ্ছা সবারই। পিঠা বানায়, সকলকে আগে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ায়। অবশিষ্ট থাকে ত নিজেরা খায়। বলতে গেলে তাদের ভাগে পড়ে খাটুনি। মেয়েরা এভাবে নিজ বাসনাকে পরিবারব্যাপী রূপ দেয়। কর্মযোগে এই হচ্ছে কামনা-নাশের উপায়। ব্যক্তিগত বাসনাকে সামাজিক রূপ দিতে হবে, তার মানে ব্যাপক হতে হতে তা মিলিয়ে যাবে—ঐ হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য।

১৯. ধ্যান-যোগের একাগ্র প্রক্রিয়া

(২) একাগ্র প্রক্রিয়া। মনের নানা বাসনার মধ্যে কোন বাসনা আপনার সকলের চাইতে প্রবল তা দেখে নিন, বেছে নিন। অন্য সব বাসনা ত্যাগ করে ঐ একটিতেই মগ্ন হয়ে যান। চিত্ত তাতে একাগ্র করুন। ধরুন, কোন বিদ্যার্থীর নানা বাসনার মধ্যে বেদাধ্যয়নের ইচ্ছা একটি। অপর সকল বাসনা হতে তা তার প্রবল। সে গুরুগৃহে গিয়ে থাকবে, যা জোটে খাবে আর বেদাধ্যয়ন করবে। ফলে মিষ্টি খাওয়ার বাসনা তার মরে যাবে। এভাবে নিজের প্রধান বাসনা যে কি তা নির্ণয় করে সেমতে সমগ্র জীবন রচনা করা হচ্ছে ধ্যানযোগের উপায়। বিদ্যার ইচ্ছা যার তীব্র এমন বিদ্যার্থীতে আমরা তা দেখতে পাই। অন্য সকল বাসনা নিগ্রহ করে বিদ্যার জন্য সে কষ্ট সহ্য করে। "সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা, কুতো বিদ্যার্থিনঃ সুখম্" এরূপ কথাই ব্যাসদেব বলেছেন। আমরা কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়ে বলি যে আমাদের ছাত্রাবাসে সুখ-সুবিধা ও বিদ্যা দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে। এই কথাটাই ভুল। সুখের দিকে মন দৌড়ায় ত বিদ্যায় মন বসবে না। নিজ বাসনাসমূহের বাছ-বিচার কর। তার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রবল তাতে একাগ্র হও। ভৌতিক

পরীক্ষার ক্ষেত্রে আজকার বিজ্ঞানীরা তাই করেন। নিজ নিজ পরীক্ষায় তাঁরা সমস্ত শক্তি ও অভিনিবেশ নিবদ্ধ করেন। এরই নাম ধ্যান-যোগ। অন্য সকল বাসনা সরিয়ে দিয়ে চিত্ত এক বাসনায় কেন্দ্রিত করতে হবে, পরে তা থেকেও উঠিয়ে নিতে হবে, এরূপই এই উপায়। একাগ্রতা লাভ হওয়ার পরে সেই বাসনাও ত্যাগ করে মুক্ত হতে হবে।

২০. জ্ঞানযোগের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া

(৩) সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া। স্থূল বাসনা ছাড়, সূক্ষ্ম আশ্রয় কর এই উপায়ের কথা এই প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে। ঝোঁক বেশভূষার দিকে হয় ত শরীরের বেশভূষার দিকে মন না দিয়ে অন্তরঙ্গের বেশভূষার দিকে মন দাও। বুদ্ধিকে সাজাও, নিপুণ বানাও। নূতন বিদ্যা অর্জন কর কলা শেখ। শরীরের স্থূল শৃঙ্গার অপেক্ষা এই বৌদ্ধিক শৃঙ্গার সূক্ষ্ম. এর চাইতেও সূক্ষ্ম শৃঙ্গারের উপায় হল হৃদয়কে শুভ গুণে মণ্ডিত কর। যে আতরে শরীর সুগন্ধিত হয় সেই আতর অপেক্ষা বুদ্ধির চাতুর্যরূপ আতর অধিক সৌরভময়। তার চাইতে হৃদয়ের গুণ-সম্পদ আরও অধিক সুগন্ধ আতর। বিঠাই মা তাঁকে কেমন সাজিয়েছেন তার খুব বর্ণনা নামদেব এক অভঙ্গে* করেছেন। মা সন্তানের বাহ্য অঙ্গ যেমন সাজান, অন্তরঙ্গ শৃঙ্গারের ঠিক তেমন বর্ণনা তাতে আছে। বাহ্য শৃঙ্গার অপেক্ষা অন্তঃশৃঙ্গার দ্বারা জীবনের শোভা বিশেষভাবে বাড়বে। শোভার স্থূল রূপ ছাড়, সূক্ষ্ম রূপ জোড়। আনন্দ কামনায় নয়, কামনার তৃপ্তিতে। স্থূল কামনার তৃপ্তি কঠিন। কারণ, সে ক্ষেত্রে বাহ্য সাধনের শরণ নিতে হয়। কামনা সূক্ষ্ম হয় ত বাধা কমে যায়। কারণ, নিজ অন্তরের সাধনসমূহ দ্বারাই তা তৃপ্ত হয়। এরূপে কামনা অন্তর্মুখ ও সূক্ষ্ম হতে হতে এক

* অভঙ্গ—এক মাত্রিক ছন্দ। তুকারাম এই ছন্দের খুব ব্যবহার করেছেন।

সময়ে একেবারে নাশ হতে পারে বা হওয়া চাই। এই হচ্ছে জ্ঞান-যোগের পদ্ধতি।

২১. ভক্তি-যোগের বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া

(৪) বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া। বাসনা ব্যক্তিগত কি সামাজিক, স্থূল কি সূক্ষ্ম এরূপ ভাগ-বিভাগ এই প্রক্রিয়ায় আমরা করি না। শুভ বাসনা ও অশুভ বাসনা এরূপ ভাগ করি। বাসনা ভাল হয় ত যেমন আছে তেমনটা থাকবে, মন্দ হয় ত দূর করে দাও। মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। সন্দেশ না খেয়ে আম খাও। মিষ্টি থেকে অপায় (অনিষ্ট) হতে পারে। রজোগুণই তাতে বাড়বে। আম স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। সত্ত্বগুণের বর্ধক। এই প্রক্রিয়ার আরম্ভেই আমরা বাসনা মারতে বলছি না। অশুভ ছাড়, শুভ আশ্রয় কর এটাই আমাদের কথা। শুভ কি, অশুভ কি তা যে যার বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করবে। যেমন মত তেমন পথ। সায়েন্স বা বিজ্ঞানের সাহায্যে কতকগুলি বাসনার শুভ-অশুভ নির্ণয় করা যেতে পারে। কোন কোন বাসনার বাছ-বিচার বিজ্ঞানের সহায়তায় করা গেলেও, অন্তে শুভ কি আর অশুভ কি তার নির্ণয় নিজ বিচার দিয়েই করতে হবে। অশুভ বাসনা ত্যাগ ও শুভ বাসনা আশ্রয় করতে করতে মন শুদ্ধ হবে, বাসনা মরে যাবে। এ হচ্ছে কামনা-নাশের বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া।

২২. বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া সব দিক থেকে সুরক্ষিত

এই চার প্রক্রিয়ার মধ্যে শেষের বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া সর্বাপেক্ষা ভয়-রহিত সুতরাং সর্বোত্তম। আর প্রায় সকল ভক্তিযোগই একে গ্রহণ করেছে। অন্য সব প্রক্রিয়ায় শক্তি যেমন আছে ভয়ও তেমন অনেক আছে। কামনাকে সামাজিক রূপ দিতে হবে একথা ব্যাপক প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে।

কিন্তু সে কামনাই যদি অশুভ হয় ত? কারো মদ খাওয়ার ইচ্ছা হয় ত এই প্রক্রিয়া অনুসারে সে শরাবের সার্বজনিক ক্লাব খুলতে পারে। কিন্তু তা থেকে সে নিজে অধঃপাতে যাবে আর সমাজও যাবে। সেরেফ সামাজিক রূপ দিলেই বাসনা শুদ্ধ হয়ে যায় তা নয়। একাগ্র প্রক্রিয়াতেও ঠিক ঐ ভয় আছে। যে বাসনাতে চিত্ত একাগ্র করা হবে তা-ই যদি অশুভ হয় ত সবই শেষ। চিত্তের একাগ্রতা যোগশাস্ত্রের বিষয়। ধ্যানযোগের আচরণ যম-নিয়ম পূর্বক করতে হয় একথা বলে পতঞ্জলি তৎসম্বন্ধে সাবধানতার ইঙ্গিত করে রেখেছেন। নতুবা তা থেকে অনর্থ ঘটবে। ধ্যানযোগ তারক না হয়ে হবে মারক। সত্য বটে, সামাজিকতায় ও একাগ্রতায় শক্তি আছে। কিন্তু বিপথগামী হলে সে শক্তিদ্বারা মানুষ রাক্ষস বনবে। সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াও সুরক্ষিত নয়। বাসনা সূক্ষ্ম হলেই পবিত্র হবে তা নয়। কাউকে যদি কাম-বাসনা পেয়ে বসে আর সে অমূর্ত কামের চিন্তা করতে থাকে তবে সম্ভবত তা আরও অধিক ভয়ানক হবে। ভক্তিযোগ দ্বারা স্বীকৃত এই 'বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া' সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। তাই ত তুলসীদাস বলেছেন, "ভগতি স্বতন্ত্র অবলম্বন ন আনা।" অন্য সব সাধনে যে ভয় আছে তা নাশ করার জন্য ভক্তিযোগের শরণ নিতে হয়। ভক্তির অন্য অবলম্বনের দরকার নাই। অন্য সব সাধন শক্তিশালী বটে তবে ভয়েরও বটে। এক দিকে শক্তি আর এক দিকে সুসংরক্ষণ। শক্তি ও ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে এরূপই ভেদ। ভক্তিতে শক্তির সংযোগ না হলে ভক্তি দুর্বল হবে কিন্তু অপবিত্র বা মারক হবে না। উল্টো, শক্তিতে যদি ভক্তির যোগ না হয় ত তা সর্বনাশই করবে। ভক্তি কোন অবস্থায়ই অকল্যাণকারী নয়। অতএব সব দিক হতে ভক্তিযোগ-স্বীকৃত বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া কামনা-নাশের সুরক্ষিত ও অনুকূল পথ। "ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি"—এই বাক্য দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে।

তৃতীয় ব্যাখ্যান

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন-মনাঃ সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিত-ধীর্ মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্ তৎতৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

এক

২৩. স্থিত-প্রজ্ঞতার সুলভ সাধন : (ক) সুখ-দুঃখ সয়ে নাও

স্থিত-প্রজ্ঞের এক পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপরের তিন শ্লোকে সেই ব্যাখ্যার এখন উত্তরোত্তর সহজ বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। এই তিন শ্লোকের প্রথমটিতে স্থিত-প্রজ্ঞের ব্যাখ্যার মানস-শাস্ত্রীয় বিবেচনা রয়েছে। ব্যাখ্যা-নিদর্শক 'উচ্যতে' শব্দ এখানে আছে বটে, তা হলেও ব্যাখ্যার প্রত্যাশা এখানে নাই। কারণ ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে। স্থিত-প্রজ্ঞের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় সকল কামনার আমূল ত্যাগের প্রত্যাশা বিদ্যমান। কিন্তু তা তেমনটা সহজ নয়। তাই এই শ্লোকে স্থিত-প্রজ্ঞের আরও সহজ লক্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে। দুঃখ আসে ত উদ্‌বেগ বোধ করো না। উদ্‌বেগ বোধ করা মানে উতলা হওয়া। এই শব্দ থেকেই এই অর্থ সূচিত হচ্ছে। 'উৎ' মানে 'উপর', 'বেগ' মানে 'গতি'। উপরে উঠতে গেলে বলদ বিপদ গোনে, হয়রান হয়, সেই অবস্থা

যেন না হয়। দুঃখ ধৈর্য ধরে সইতে হবে। তার কাছে হার মানতে নাই। দুঃখের মত সুখও সাবধানে হজম করবে। মানুষে দুঃখ যেচে নেয় না। তাই তাতে মোহিত হওয়ার ভয় নেই। ধৈর্য ধরে সয়ে নিলেই হল। কিন্তু সুখের জন্য মানুষ লালায়িত। তা মনকে ভোলাতে পারে। তাই সুখে ভয় আছে। সুখ সম্বন্ধে ভুল ধারণা হেতু সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অতএব সুখ এলে মনকে সাবধানে গুটাতে হবে, রক্ষা করতে হবে। দুঃখ এসেছে কি ধৈর্য ধারণ করবে। সুখ এলে তার ফাঁদে যেন মন ধরা না দেয়। তাকে গুটিয়ে নিতে হবে। ঢালুর দিকে যাওয়ার সময় বলদকে দৌড়াতে দেখা যায়। তদ্রূপ সুখের সময়ে মনের বৃত্তি দৌড়াতে থাকে। তাই তাকে সংবরণ করা দরকার। এ কাজ তত কঠিন নয়। কামনা-ত্যাগের তুলনায় খুবই সহজ। কামনার দুই রূপের ছবি এখানে ধরা হয়েছে—সুখ চাওয়া আর দুঃখ না চাওয়া। এ দুইকে সংযত রাখার কথা এখানে বলা হয়েছে।

২৪. (খ) বৃত্তি উঠতে দেবে না

কামনা যেমন দ্বিবিধ, উহার পরিণাম তদ্রূপ তিন প্রকার: (১) তৃষ্ণা (২) ক্রোধ ও (৩) ভয়। অনুকূল বেদনা থেকে তৃষ্ণা জন্মে। প্রতিকূল বেদনা থেকে ক্রোধ। ভয় ক্রোধেরই, প্রতিকূল বেদনারই এক রূপ। কিন্তু বেঁচে থাকার এক বিশেষ আসক্তি আমাদের আছে বলে ভয়বৃত্তি ক্রোধ থেকে ভিন্ন মনে করা হয়। আমাদের জিজীবিষার উপর আঘাত লাগলেই ভীতি উৎপন্ন হয়। প্রাণীমাত্রেই এ বৃত্তি স্বরস-বাহী অর্থাৎ রক্তকণায় ব্যাপ্ত আছে। জীবন-নাশের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ামাত্র তা জাগ্রত হয়ে ওঠে। অত্যাচারী লোকেরা এই ভয়বৃত্তির ষোল আনা সুযোগ নিয়েছে। ভয় দেখিয়ে লোককে তারা গোলাম বানিয়েছে। বস্তুত টোটা-বন্দুক

ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা এই ভয়বৃত্তি তাদের ক্ষমতার প্রকৃত আধার। অতএব তৃষ্ণা ও ক্রোধ এই দুই বৃত্তি দূর করার জন্য যেমন স্বতন্ত্র সাধনা করতে হয়, ভয়বৃত্তি জয় করার জন্যও তেমনি স্বতন্ত্র সাধনা করা আবশ্যক। তৃষ্ণা, ক্রোধ ও ভয় এই তিন বৃত্তি নাশ হলে প্রজ্ঞা স্থির হয়। এই সব বৃত্তি বুদ্ধির উপর আঘাত হানে। তাই তাদের দূর করে দেওয়ার পরামর্শ এখানে দেওয়া হয়েছে। এভাবে এই শ্লোকে স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতির মানস-শাস্ত্রীয় বিচার করা হয়েছে। তার পরের শ্লোকে বলা হয়েছে কর্মযোগ আচরণ করতে করতে কিভাবে সংযম-সাধনা করতে হয় সেকথা।

২৫. স্থিত-প্রজ্ঞতার সুলভতর সাধন: বৃত্তির প্রবাহে বয়ে না যাওয়া

"যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ।" মনকে কোথাও লিপ্ত হতে দিতে নাই। মনকে কোথাও আটকা পড়তে, মজতে কিংবা ঘর বাঁধতে দিও না। মানুষের মন কোথাও-না-কোথাও বাঁধা পড়ে। কেউ মজে বইয়ে ত কেউ মজে ক্ষেতে। তাকে কোথাও মজতে দিও না একথা এখানে বলা হয়েছে। এর আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে অশুভ আসে ত তাকে দুঃখদায়ক হতে দিও না ; শুভ আসে ত তাকে সুখদায়ক হতে দিও না। এখানে তার চাইতে সহজ সাধনের কথা বলা হয়েছে। শুভ হলে সুখ বোধ করবে না, এরূপ বলা হয় নি। সুখী হবে হও। আপত্তি নাই। কিন্তু তাতে পাগলপারা হয়ো না। হর্ষিত হয়ো না। আনন্দে আটখানা হয়ো না। তালি বাজিও না। অভিনন্দন করো না। ছেলে হয়েছে ত ভাল লাগছে, বেশ লাগতে দাও। কিন্তু সন্দেশ বিতরণ করো না। বিয়ে হয়েছে, ভাল লাগছে। লাগুক। কিন্তু ব্যাণ্ড্ বাজিও না। এটুকুই এখানে বলা হয়েছে। তদ্রূপ, অশুভ ঘটেছে, খারাপ লাগছে?

লাগুক না খারাপ। কিন্তু মনে সন্তাপ যেন না হয়। বুদ্ধিতে বিকারের আঁচ লাগে এমনটা তীব্র হতে দিও না। তীব্র বিকার, বুদ্ধির উপর আঘাত হানে। বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। চাণক্যের বচনে আছে: আমার সব যাক, কিন্তু বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখো। কর্মযোগী মানুষ প্রত্যক্ষ ব্যবহারে কিভাবে চলবে এ হচ্ছে তার বিবরণ। বৃত্তিতে অল্পমাত্র গাম্ভীর্য থাকলে মানুষের পক্ষে এভাবে চলা সহজ। কিন্তু বৃত্তি যদি বাঁদরের মত হয় ত সংযম অসাধ্য। বাঁদর আনন্দে কিল কিল করে আর দুঃখে করে কিচ কিচ। বৃত্তি যেন তদ্রূপ না হয়। সামান্য গাম্ভীর্য থাকে ত এ কঠিন মনে হবে না।

২৬. স্থিতপ্রজ্ঞতার সুলভতম সাধন: ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়মন

সংযম আরও সুলভ ও স্পষ্ট করার জন্য পরের শ্লোকে কচ্ছপের উদাহরণ দিয়ে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। কচ্ছপ নিজ অঙ্গসমূহ গুটিয়ে নেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে গুটিয়ে নাও। এমনি ত কচ্ছপ নিজের সব অঙ্গকে অবাধে চলতে দেয়, কিন্তু ভয়ের স্থানে তাদের গুটিয়ে নেয়। তদ্রূপ যেখানে ভয় আছে সেখান থেকে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটিয়ে নাও। যেখানে পারমার্থিক কাজে আসবে সেখানে তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। এ সাধন আরও সহজ। ভয় থাকে ত পিছিয়ে আসবে। ভয় নেই ত অবাধভাবে ছেড়ে দেবে। কেমন সোজা, সহজ পথ এ! পশুও এ বুঝতে পারে। তাই না কচ্ছপের উদাহরণ। কচ্ছপের মত জন্তু এভাবে চলে আর তুমি ত মানুষ, একথাই গীতা বলে।

দুই

২৭. ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ বস্তুত কঠিন নয়

সহজ ত বলা হল কিন্তু কথাটা আমাদের কাছে কঠিন ঠেকে। কথাটা মুখ্যত অভ্যাসের। একদম শুরু থেকে ছোটদের যদি এ অভ্যাস হয় তবে গীতা তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে। নিছক অভ্যাসের কথা। বলা হয় যে গীতা মনুষ্য-স্বভাবের উল্টো চলতে বলে। আসলে তা নয়। স্বভাবধর্মেই শিশুর রুচি শুদ্ধ। আমরা জোরজবরদস্তি করে তার জিভে আজেবাজের রুচি উৎপন্ন করি। তার রুচি বিকৃত ও কৃত্রিম করে দিই। ছোটদের স্বভাবত যাতে রুচি, যা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তা-ই তুমি কর, একথাই গীতা বলে। কুশিক্ষা দিয়ে ছোটদের রুচি আমরা বিকৃত করে দিই। তাই পরে আবার উল্টো শিক্ষা দিয়ে তা ঠিক করতে হয়। কুশিক্ষা দিয়ে প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে দুষ্ট বানানো হয়। তাই পরে তাদের সামলানো কঠিন হয়ে ওঠে। শুরু থেকেই যদি ভাল অভ্যাসে তারা অভ্যস্ত হয় তবে ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ হবে। জ্ঞানদেব বলেন, "আমার ইন্দ্রিয়ের স্বভাব এরূপ হয়েছে যে যা দেখতে নেই সেদিকে চোখ যায় না, যা শুনতে নেই কান তা শোনে না।" এ কেন কঠিন মনে হবে? ওখানে আগুন আছে বুঝি ত সেখানে কি হাত যায়? উল্টো, আগুনে যদি হাত দিতেই হয় তবে বিচার দ্বারা মনকে প্রস্তুত করেই লোকে হাত দেয়। তদ্রূপ এখানে ভয় আছে এরূপ নিশ্চিত বোধ জন্মে ত সেখানে ইন্দ্রিয় যাবেই না। ভয়ের স্থানে ইন্দ্রিয়গুলিকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়াই ত কঠিন মনে হওয়ার কথা। কিন্তু কুশিক্ষার ফলে তার ঠিক উল্টো অবস্থা আমরা সৃষ্টি করে বসেছি। যা কঠিন ও অস্বাভাবিক তাই আমাদের সহজ ও সোজা মনে হয়। এই ব্যাধির চিকিৎসা গীতায় নাই।

গীতার দৃষ্টিতে যে সাধন একেবারে ছোটদের পক্ষেও সহজসাধ্য এমন সাধনের কথাই এখানে বলা হয়েছে। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়-জয় কঠিন মনে হওয়ার কথা নয়, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

২৮. ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ প্রকারে দুই : সংযম ও নিগ্রহ

কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এরূপ দুই প্রকার ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা বলা হয়। এই দুইয়ের একটু আলোচনা করা যাক। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কিছু সময়কার কথা। ইন্দ্রিয়-সংযম সারা জীবনের তত্ত্ব। উদাহরণার্থ ধরুন, মিষ্টি খাওয়ার দিকে আমার ঝোঁক। মিষ্টি খাওয়া খারাপ, তা নয়। কিন্তু মিষ্টির লোভ খারাপ। তাই কিছু দিনের মত মিষ্টি খাওয়া আমি একেবারে ছেড়ে দিচ্ছি। তার জন্য নিজেকে সংশোধন করতে, অভ্যস্ত করতে, দমন করতে হয়। ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করার জন্য, বশে আনার জন্য কিছুকাল আমাদের নিগ্রহ করতে হয়। মিষ্টি খাওয়া কিছু পাপ নয়। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে মিষ্টির দরকারও আছে। কিন্তু মিষ্টির লোভকে বশে আনার নিমিত্ত কিছু সময় পর্যন্ত আমি তাকে নিগ্রহ করলাম। সেই সময়ের অন্তে পুনরায় আমি মিষ্টি খেতে থাকি। কিন্তু পরিমিতরূপে আর মেপে-জুকে। এরই নাম সংযম। তদ্রূপ মৌনের উদাহরণ নিন। মৌন কিছু সময়ের সাধন। মিত-ভাষণ নিত্য সাধন। উপবাসও তেমনি নৈমিত্তিক সাধন। নিয়মিত ও পরিমিত আহার নিত্য সাধন। আর এখানেই মানুষের পরীক্ষা। একটি সারগর্ভ গুজরাটী প্রবাদ বলে, "মানসানী পরীক্ষা খাটলে নে পাটলে"*—মানুষের

* 'খাটলে নে পাটলে'=খাটের উপর অর্থাৎ রোগশয্যায় আর পাটের উপর অর্থাৎ আহারের আসনে। পাট=পিঁড়ি।

খেতে বসলে আর অসুখে পড়লে। আহার ও অসুখ এমন প্রসঙ্গ যখন মানুষের স্বভাবের সকল দোষ উপরে ভেসে ওঠে। মানুষ কখনও বা অতিরিক্ত খায়, কখনও বা করে উপবাস। পরিমিত আহারে তুষ্টি নাই। দুই দিকেই চরম। মাঝের পরিমিততা ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয়সমূহকে মধ্যখানে রাখার নাম সংযম। তার জন্য কখন কখন তাদের অন্য চরমে নিতে হয়—তাকে বলে নিগ্রহ। নিগ্রহের আবশ্যকতা সুস্পষ্ট। কিন্তু তা নিত্য ধর্ম নয়।

২৯. এর আরও একটু বিবরণ

নিগ্রহ সাময়িক আর সংযম নিত্য এরূপ পার্থক্য আমরা করেছি। কেবল দুইয়ের তারতম্য দেখাবার জন্যই তা করা হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে। কারণ, একটু চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে যে সংযমের মত নিগ্রহও নিত্য হতে পারে। আমরা দেখেছি যে উপবাস সাময়িক আর মিতাহার নিত্য। কিন্তু ধরুন, কেউ নিয়ম করেছে প্রত্যহ অমুক সময়ে খাবে—আর এরূপ নিয়মবাঁধা ইষ্টও বটে—ত মাঝে কেউ যদি তাকে খাবার এনে দেয় তবে সে খায় না। এর নাম নিগ্রহ। কিন্তু এ ত সুস্পষ্ট যে সাময়িক নয় বলে একে নিত্যকার বলতে হবে। মৌন সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। সত্য বটে, মৌন সাধারণত সাময়িক। কিন্তু বাণী-নিগ্রহের প্রসঙ্গ প্রতিদিন খুবই উপস্থিত হতে পারে। কেউ কিছু বলেছে। সে কথার উত্তর না দিয়ে বলার আগ্রহ অনেক সময় চেপে যেতে হয়। বাণীর এরূপ নিগ্রহ নিত্যকার বস্তু হয়ে গেছে। তার অর্থ, নিগ্রহ ও সংযমের আচরণ বস্তুত প্রত্যহই করতে হয়। এ দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য করা হল সে কেবল তারতম্যের কারণে। আসলে দুইই মূলে এক। নিগ্রহ ও সংযমে একটি বস্তু সমান ; সে হচ্ছে নিজের উপর অঙ্কুশ রাখা।

সারাংশ, সংযম ও নিগ্রহ এ দুইয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান রয়েছে তা আগে বুঝে নিতে হবে আর তার পরে তা ভুলে যাওয়াই ভাল হবে। কিন্তু নিগ্রহ শব্দটি আরও একটু স্পষ্ট করা দরকার। নিগ্রহে নিপীড়নের ভাব আছে এরূপ কথা মনে হতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ শব্দে জোর-জবরদস্তির ভাব নাই। কোন বিশেষ অর্থের দ্বারা শব্দ শৃঙ্খলিত নয়। তাই প্রসঙ্গানুসারে অনেক অর্থে তা ব্যবহার করা চলে।

৩০. গীতার দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়-জয়ের মহত্ত্ব

এখানে স্থিত-প্রজ্ঞের মুখ্য লক্ষণ ও তার তিনপ্রকার আলোচনা শেষ হল। এই আলোচনার অন্তিম ক্রিয়াত্মক স্থূলভ সাধনের, ইন্দ্রিয়-জয়ের বিশ্লেষণ পরে দশ শ্লোকে করা হয়েছে। গীতার কাছে এর গুরুত্ব এত অধিক যে অনেক অধ্যায়ের স্থানে স্থানে এই বিশ্লেষণ দেখা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের আলোচনার পরে ইন্দ্রিয়-জয়ের এক স্বতন্ত্র প্রকরণ সংযোজিত হয়েছে। এখানে এর পরে এই বিষয়ের বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করতে হবে। 'কিরূপে' এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে বিজ্ঞান। 'কেন'-প্রশ্নের মীমাংসা করছে তত্ত্বজ্ঞান। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কিভাবে করতে হবে আর কেন করতে হবে অর্থাৎ—প্রজ্ঞার স্থিরতার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, এই দুই প্রশ্নের উত্তর এর পরে আপনাদের খুঁজতে হবে।

চতুর্থ ব্যাখ্যান

এক

৩১. ইন্দ্রিয়-জয়ে বিজ্ঞানের ভূমিকা

স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ যেগুলিকে বলা হয়, প্রথম চার শ্লোকে বস্তুত তা শেষ হয়েছে। এর পরে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান বুঝে নিতে হবে। প্রথম তিন শ্লোকে বিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যন্ত উত্তরোত্তর সুলভ সাধন উপস্থিত করা হয়েছে। (১) প্রথমে বলা হয়েছে, কামনা ত্যাগ কর। (২) তার পরে বলা হয়েছে, কামনার পরিণাম হতে দিও না—তৃষ্ণা, ক্রোধ ও ভয়ে তার পর্যবসান হতে দিও না। (৩) তার পরে আবার বলা হয়েছে, পরিণাম হয় ত তা বশে রাখা চাই : বুদ্ধির উপর আক্রমণ হতে দিও না। আর শেষে (৪) বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়গুলিকেই গুটিয়ে নিতে হবে। এভাবে পৃথক পৃথক ব্যূহ রচনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সাধনা কিভাবে আরম্ভ করতে হবে তা দেখানোর জন্যই এই আলোচনা করেছি। এ থেকে কেউ যেন মোটেই মনে না করেন যে সাধনার অন্তিম ধাপে না পৌঁছালেও স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। সর্বশেষে ইন্দ্রিয় গুটিয়ে নেওয়াকে সর্বাপেক্ষা সুলভ সাধন বলা হয়েছে। কিন্তু নিগ্রহ ও সংযম এই দুই অর্থে ইন্দ্রিয় বশ হলেই যে মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হয় তা নয়। ততটাতেও নয় ? না, বস্তুত ততটাতে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়-জয় হয় না। ইন্দ্রিয় বশ হলে সে অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্তরের কামনাও সমূলে উচ্ছেদ করা

দরকার। আমি যেমন বলব ইন্দ্রিয় তেমন চলবে, এই অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা কামনার বীজ উৎখাত করতে হবে। আমি মনে করি এই কামনা-বীজ শেষ হলে পরে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সফল হয়। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের এতটাই সূক্ষ্ম আমার যাচাই। আর তা এখন এক শ্লোকে বলা যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-বিজ্ঞানের এই আরম্ভ।

৩২. নিরাহার প্রাথমিক সাধনা, রস-নিবৃত্তি পূর্ণতা

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

"নিরাহারের সাধনা দ্বারা বিষয় দূর হয়। কিন্তু বিষয়ের রস ত থেকেই যায়। পর-দর্শন দ্বারা তা-ও পরে নিবৃত্ত হয়।" এ হচ্ছে এ শ্লোকের ভাবার্থ। বিষয় দূর হলে, বিষয় থেকে ইন্দ্রিয় গুটিয়ে নিলে, ইন্দ্রিয়-জয় পূর্ণ হয় একথা যেন মনে না করি। নিরাহার শব্দের আহারের অর্থ রসনার আহার ত বটেই, কিন্তু তা ছাড়া সর্ব ইন্দ্রিয়ের ভোগ এরূপ ব্যাপক অর্থও তার করতে হবে। তার মানে এখানে এই শব্দটি উপলক্ষণাত্মক। ইন্দ্রিয়সমূহের আহারের নিগ্রহ হচ্ছে প্রাথমিক সাধনা। তাতেই যে সাধনার সমাপ্তি তা নয়। সবে মাত্র তা আরম্ভ হল। বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হওয়ার দরুন এবার অন্তরের রস দূর করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার যোগ্যতা ও শক্তি লাভ হল। প্রকৃত সাধনার অর্থাৎ আন্তরিক সাধনার আরম্ভ হল। অন্তরের রস যখন শুকিয়ে যাবে সাধনা তখন পূর্ণ হবে। বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ থেকে অন্তরের রস দূর করবার শক্তি জন্মে। তাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে গীতা এর সমাবেশ করেছে।

৩৩. গীতার গুরু-দৃষ্টি : পূর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক সাধনার পথ-নির্দেশ

তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বলা যায়, সকল কামনা ত্যাগ কর। বস্, এটুকু বললেই যথেষ্ট। স্থিত-প্রজ্ঞের ব্যাখ্যার আরম্ভ হয়েছে তত্ত্বজ্ঞানীর ভাষা দিয়ে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর রীত এক আর শিক্ষকের আর এক। শিক্ষক বিদ্যার্থীর ভূমিকা ও অধিকারের দিকে লক্ষ্য রেখে বলেন। অন্তিম সাধনা পূর্ণ না হলে ডিপ্লোমা পাওয়া যাবে না একথা তিনি স্পষ্ট বলে দেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন পাঠও দিতে থাকেন। তার মানে, একদিকে তিনি শাস্ত্রীয়তা বজায় রাখেন আবার অন্যদিকে কৃপা করে ছাত্রকে এমন উপায়ের কথা বলেন যাতে তার মনে আশা ও ধীরভাবে কাজ করার স্ফূর্তি জন্মে। গীতার পদ্ধতিও এরূপই বাৎসল্যে ভরা। কচ্ছপের উদাহরণ হচ্ছে প্রথম পাঠ। এক পাঠ শেষ হয় ত পরের পাঠ শুরু হয় ; এভাবে গুরুমার বাৎসল্যে গীতা একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে চলে। ভগবানকে ভক্তিপূর্বক একবারটি ডাকলেও মানুষ মোক্ষাভিমুখ হয় দয়ালু সাধু-সন্তেরা এই আশ্বাস পর্যন্ত দিযে রেখেছেন। ইষ্টাভিমুখে তার মোড় ঘুরে যায়। তাতেই গন্তব্যে পৌছান গেল তা নয়। কিন্তু দিক ঠিক হয়ে গেলে মনে আশার সঞ্চার হয়। আশা বাড়াতে বাড়াতে গন্তব্যে পৌছে দেওয়াই গুরু-দৃষ্টি।

৩৪. প্রাথমিক সাধনা ত অপূর্ণ বটেই, কিন্তু তা বলে কপটাচার নয়

আসল কথা, যতদিন অন্তরের রস শেষ না হয় ততদিন চেষ্টা করে যেতে হবে। ততদিন পর্যন্ত কেন? ততদিন পর্যন্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে

গুটিয়ে নিতে হবে একথার উপর কেউ কেউ বলতে পারেন যে এ ত কপটাচার হল। আত্মনাশ যারা করতে চায় তারা এ তর্কের ফেরে পড়বে। সাধক কপটাচার করছে কিনা তা ত সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়বে। কারণ সাধনা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ত তাকে চেষ্টা করে যেতেই হবে। ততদিনে তার মনের অবস্থায় ও আচরণে ব্যবধান দেখা যাবেই যাবে। প্রার্থনায় বসেছে ত তার মন এদিক-ওদিক দৌড়াবে। সে স্থলে বলা যাবে, "প্রার্থনা এ করে না, করে প্রার্থনার ঢঙ।" লোক দেখানোর জন্য প্রার্থনার ভান করে একথা সপ্রমাণ হলেই কেবল সাধকের উপর ওরূপ আরোপ করা চলে। কিন্তু তা ত সে করে না। ছলনার উদ্দেশ্য নাই ত ছলনা কেন বলবেন? মন যতদিন বশে না আসছে ততদিন ইন্দ্রিয়সমূহ রুখতে যাওয়া ছলনা, গীতার এই শ্লোক থেকে কেউ কেউ এরূপ অর্থ বার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। "রসন্ স্বস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে" এই যদি ভাষা হত তা হলে ওরূপ অর্থ করা যেত। কিন্তু এখানে 'রসোঽপি' বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখার গুরুত্ব আছে, 'অপি' শব্দ দ্বারা একথা সূচিত হচ্ছে। কিন্তু ততটাতেই সাধনা পূর্ণ হয় না, রসের অন্ত হওয়া চাই—এতটাই অর্থ এতে নিহিত। রস না যাওয়া পর্যন্ত যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তাকে ব্যর্থ চেষ্টা বলতে পারেন। কিন্তু কপটাচার তা নয়। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের দুই দিক—স্থূল ও সূক্ষ্ম। দুই প্রকারের নিগ্রহ করে শেষটায় স্থিতপ্রজ্ঞের ঐ মূল ব্যাখ্যাতে নিয়ে ঠেকাতে হবে।

৩৫. সাধনার পূর্ণতা পরদর্শনে অর্থাৎ আত্মদর্শনে

অন্তরের রস না যাওয়া অবধি সূক্ষ্ম অর্থে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পুরা হয় না। সে রস কিরূপে দূর হবে? উত্তরে বলা হয়েছে, পরদর্শন দ্বারা, আত্ম-

দর্শন দ্বারা। পর-তত্ত্ব মানে সব চাইতে দূরেকার তত্ত্ব। বস্তুত সে তত্ত্ব সব চাইতে দূরের নয়, সব চাইতে কাছের। তা পর-তত্ত্ব নয়, স্ব-তত্ত্ব। কিন্তু উল্টো বুলি চালু হয়ে গেছে। তার কারণ এই যে আমরা শরীর হতে অর্থাৎ বাহ্যতত্ত্ব হতে গণনা শুরু করে থাকি। শরীর সর্বাপেক্ষা বাইরের। আর তাকেই মানি সব চাইতে নিকটের বলে। তার পরে মন, তার পরে বুদ্ধি আর বুদ্ধির পরে আত্মা, এরূপ উল্টো গণনার ফলে যা সব চাইতে কাছের তা সব চাইতে দূরের হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং গীতা এরূপ কথা বলেছে। কিন্তু সেখানে পর শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ কিংবা সূক্ষ্ম বুঝতে হবে। আত্মা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা নিকটতম। তার দর্শন বিনা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পূর্ণ হয় না। তার মানে প্রথম শ্লোকে যা বলা হয়েছে ঠিক সেখানে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

দুই

৩৬. ইন্দ্রিয়ের স্বভাব দুর্নিবার এ বিষয়ে মনুর বচন

এখানে স্বভাবতই কেউ বলবেন, "বেশ ত মজা, উত্তরোত্তর সহজ সাধনের আশ্বাস দিয়ে আমাদের আচ্ছা ধোঁকা দেওয়া হল। লোভ দেখানো হল সন্দেশের আর বার করা হল লাঠি। ভিতরের রস দূর করা চারটি কথা নয়। তা করার উপায়?" তারই প্রক্রিয়া এখন এখানে বলা হচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপত্তিকারীদের বিরুদ্ধ যুক্তি ভগবান এক শ্লোকে দৃঢ় করে নিচ্ছেন।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

এর অর্থ হচ্ছে—এমন কি প্রযত্নশীল ও বিচারবান মানুষের ইন্দ্রিয়ও দুর্নিবার বেগে মনকে আকর্ষণ করে নেয়। মনুরও এমন একটি বচন আছে। অনেকে সেই বচনের ও গীতার এই শ্লোকের একই অর্থ করেন। "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা, ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবান্ ইন্দ্রিয়-গ্রামো, বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" এ হচ্ছে মনুর বচন। "মা, বোন, মেয়ে এদের থেকে মানুষের সাবধান থাকা চাই, ইন্দ্রিয়-সমূহ বলবান। সুযোগ পেয়েছে ত বিদ্বানদেরও টেনে নেয়।"

৩৭. মনু ও গীতার দৃষ্টি এক নয়

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মনুর এই বচনের সঙ্গে গীতার বাক্যের ঐক্য নেই। মনু সাধারণ মানুষের আচরণের সামাজিক সীমা নির্দেশ করেছেন। গীতায় করা হয়েছে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আলোচনা। "নিজের উপর মাত্রাধিক বিশ্বাস মানুষের রাখতে নেই। বাহ্যতও সে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করতে সক্ষম একথা বলা চলে না।" এ হচ্ছে মনুর দৃষ্টি। নিজ দৃষ্টি ও তখনকার অবস্থা অনুসারে তিনি সর্বসাধারণের জন্য এক নিরাপদ সামাজিক নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। গীতার বাক্য সাধকের জন্য তাই তাতে এরূপ অবিশ্বাস দেখানো হয়নি। স্থূল বা বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পর্যন্ত তোমার দ্বারা সম্ভবপর নয় গীতা সাধক সম্বন্ধে একথা বলতে চায় না। ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্যত দমন করে আমরা নিরাহার হতে পারি একথা এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে বিষয় হতে আমরা ইন্দ্রিয় গুটিয়ে নিতে পারি একথা গীতা মানে। কেবল তাই নয়, উল্টো, একথাই বলে যে, তা অবশ্য করা চাই। মনু এতটা প্রত্যাশা

করেন না। সাধারণ মানুষের কাছে সাবধানতার বাণী মাত্র উচ্চারণ করে তিনি নিরস্ত। গীতার বৃত্তি এই বিষয়ে আলাদা। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হতে সরিয়ে নিলেও হার না মেনে উল্টো তারা মনের ওপর হামলা চালায়, এই আধ্যাত্মিক বিচার এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। বাইরের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটিয়ে নিলেও তারা মনে আসর জমিয়ে বসে। তার ফলে ইচ্ছা না থাকলেও মানসিক বিষয়-সেবন চলতে থাকে। সে স্থলে সূক্ষ্ম অর্থে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সম্ভব নয়, একথাই গীতা বলতে চায়।

৩৮. জ্ঞানী ও চেষ্টাশীল ব্যক্তির মনকেও ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করতে পারে

যে উত্তমরূপে বিচার-পূর্বক প্রযত্ন করে তারও একপ হয়। "যততো হ্যপি, বিপশ্-চিতঃ অপি" এভাবে দু জায়গায়ই অপি শব্দ পড়তে হবে। 'বিপশ্চিৎ' শব্দে 'বিপঃ' আর 'চিৎ' এই দুই শব্দ আছে। 'বিপঃ' হচ্ছে 'বিপ্' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন। 'বিপ্' জ্ঞানার্থক ধাতু। বিপ্র শব্দেও তাই। বিপ্-এর মানে 'জ্ঞানী'। 'বিপশ্-চিৎ' মানে বহু জ্ঞানে যে জ্ঞানী —জ্ঞাতা। 'এরূপ যিনি—জ্ঞাতা ও প্রযত্নবান—তাঁর পক্ষেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-জয়ের সাধনা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, ইন্দ্রিয় তার মনকেও ভুলানোর ফিকিরে থাকে'—এ কথাই গীতা এখানে বলছে।

৩৯. পরন্তু জ্ঞান ও তিতিক্ষাপূর্বক প্রযত্ন এ হচ্ছে মানুষের দুই শক্তি

মানুষের দুই শক্তি আছে—জ্ঞান ও তিতিক্ষাপূর্বক প্রযত্ন। তৃতীয় কোন শক্তি তার নাই। মানুষের হাতের এই দুই শক্তি ব্যবহার করে

দেখলাম তবুও ইন্দ্রিয় প্রবল হয়ে মনে আড্ডা গেড়ে বসে, একথা বলেন ত ব্যাপার কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বটে। যত্নবান বিপশ্চিৎ পুরুষ মানে তত্ত্বজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই দুই শক্তিসম্পন্ন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে এই পুরুষকেই 'ধীর' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। 'ধীর' শব্দের ব্যবহার দুই ভাবে করা যায়। 'ধী' মানে বুদ্ধি আর 'ধীর' মানে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। কিন্তু কেবল জ্ঞানে সাধনা পূর্ণ হয় না। জ্ঞান আছে আর সহ্য করার শক্তি, তিতিক্ষা, নাই এরূপ অবস্থায় মানুষ টিকতে পারে না। অশেষ দুর্গতি হলেও মানুষ কেবল জ্ঞানবলে শেষ পর্যন্ত সে কষ্ট সইতে পারবে একথা বলা কঠিন। একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। 'পৃথিবী ঘোরে' একথা বলেছিলেন বলে তাঁকে ভয়ানক কষ্ট দেওয়া হয়। তখন তিনি বলেন, "আনুন, আপনারা যা বলছেন তাতে সই করে দিচ্ছি।" পৃথিবী ঘোরে না এইরূপ মুসাবিদা-পত্রে তাঁকে সই করতে বলা হল। কষ্ট অসহ্য হওয়ায় তিনি রাজী হতে বাধ্য হন। কিন্তু স্বাক্ষরের নিমিত্ত যখন মুসাবিদা সামনে ধরা হল তখন তিনি বললেন, "আমি কি করব ? আমি না বললেও তা ঘুরছে, ঘুরছে, ঘুরছেই।" ভাবার্থ এই যে জ্ঞানের সঙ্গে তিতিক্ষাও চাই। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ধীরতাও থাকা চাই। ধীর শব্দের অপর অর্থে এই ভাব আছে। এই অর্থের জন্য ধীর শব্দকে 'ধৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করতে হবে। ধীর মানে ধৃতিমান, ধৈর্যবান, তিতিক্ষাবান। গীতায় এই শব্দ এই দুই অর্থেই ব্যবহার হয়েছে।

৪০. তাও যদি যথেষ্ট না হয় তবে উপায় ?

এরূপ তত্ত্বজ্ঞান-তিতিক্ষা-সম্পন্ন ধীর পুরুষই শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করতে সমর্থ হয়ে মোক্ষ-লাভের যোগ্য হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান

একথা বলেছেন। কিন্তু এই দুই শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সমূহ মনকে মোহের ফাঁদে ফেলে, স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণে ভগবান এরূপ বলে রেখেছেন। যত্নবান বিপশ্চিৎ পুরুষেরও ইন্দ্রিয় বশে নয়, ইন্দ্রিয় এমন লোককেও হারিয়ে দেয়, একথা বললে মনে হতে পারে যে তবে ত কোন আশাই নাই। এ ত নিরাশা-বাদ হল। তার অর্থ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের অর্থ আপনি আরও কঠিন করে দিচ্ছেন, আপত্তিকারীদের এই আপত্তি গীতা ভাল করেই পাকা করে দিলে। এই থেকে এখন কিভাবে পথ কাটা যাবে সে কথাই পরের শ্লোকে বলা হবে।

পঞ্চম ব্যাখ্যান

এক

৪১. মনু ও গীতা বচনের আরও বিশ্লেষণ

মনু ও গীতা-বচনের পার্থক্য আমরা দেখেছি। এখন তা আরও স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল হবে। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই দুইয়ের মধ্যে মন অবস্থিত। অতএব যে ইন্দ্রিয়কে বশ মানাতে চায়, সে মনকেও বশ মানাতে চায়। কিন্তু মন এমনি বশ মানে না। তাই গীতা বলে প্রথমে ইন্দ্রিয় বশে আন। তার মানে এই নয় যে ততটাতেই মন বশে আসবে। উল্টো, বিষয় থেকে বিযুক্ত হলে ইন্দ্রিয় মনের উপর হামলা করে। সাধক একথা জানে। সে নিজেকে মন থেকে আলাদা করে নেয়। সে জানে যে মনের ওপর হামলা চলছে। সে মনের অধীন হয় না। তার সাথে সহযোগও করে না। গীতার ভাষায় এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। "হরন্তি প্রসভং মনঃ"—ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হয়ে তার মনকে টেনে নেয়, একথা বলা হয়েছে। তাকে টেনে নেয় এরূপ বলা হয় নাই। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সাধকের মন আকর্ষিত হয়। সাধক আকর্ষিত হয় না। মনু কেবল এটুকু বলেন নাই। তিনি বলেছেন, "উদ্দাম ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বানকেও টেনে নেয়। তার মনকেই নয়, স্বয়ং তাকেই টেনে নেয়।" "বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" বাগ মানাতে মানাতেও ইন্দ্রিয়সমূহ মনের ওপর আক্রমণ চালায়। মনের ওপর তারা আক্রমণ চালাতে না পারে সে উপায় বার করা চাই। কিন্তু প্রযত্নশীল

বিদ্বানের পক্ষেও তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তার মানে সাধকের মাঝামাঝি অবস্থাটা ঘোর সংগ্রামের কাল। মন বিষয়ের দিকে দৌড়ায়। সাধক তার সঙ্গে সহযোগ করে না। ওদিকে মন আদৌ না যায় এই স্থিতিতে তার পৌঁছানো চাই। আর তার তত্ত্বজ্ঞান ও তীব্র প্রযত্নও যদি এই কাজে উন (অপর্যাপ্ত) হয় ত কি করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পরের শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

৪২. বিচার-পূর্বক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করার পরে যখন দেখা যাবে যে নিজ শক্তিতে কুলোচ্ছে না তখন ভক্তির আশ্রয় নেবে

'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' এর অন্বয় এরূপ হবেঃ যুক্তঃ সন্ তানি সর্বাণি সংযম্য মৎপরঃ আসীত। বিচার-পূর্বক সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম করে ঈশ্বর-পরায়ণ হয়ে থাক। জ্ঞান ও তিতিক্ষার বলে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে আনা চাই-ই। আবশ্যক বোধে নিগ্রহের আর প্রয়োজন বোধে সংযমের পথ আশ্রয় করো। এভাবে প্রথমে বিচার-পূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে নিয়ে এস. একথা বলা হয়েছে। এরূপে নিগ্রহ ও সংযম এই দুইয়ের সংগ্রাহক শব্দ একই—সে হচ্ছে 'নিরোধ'। গীতা বলে যে জ্ঞান ও তিতিক্ষার বলেই নিরোধ-শক্তি লাভ করতে হয়। কিন্তু এভাবে স্থূল উপায় সহায়ে ইন্দ্রিয়-নিরোধ করলেন, তবু যতদিন মন বশে না আসছে ততদিন নিরোধ পূর্ণ হয় না। মনো-নিরোধের কাজে মানুষের বল কম পড়ে। সেখানেই ভক্তির কথা আসে।

৪৩. সেখানেই ভক্তির আবশ্যক

মানুষের পুরুষার্থ-শক্তি যেখানে কুণ্ঠিত হয়, রণে ভঙ্গ দেয় সেখানে ভক্তির আবশ্যকতা উৎপন্ন হয়। পরিপূর্ণ প্রযত্ন করা ছাড়া ভক্তির স্থান

হয় না। ঈশ্বর আমাদের যে শক্তি দিয়ে রেখেছেন তার পুরোপুরি ব্যবহারই হচ্ছে নম্রতা ও আস্তিকতা। আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা 'বাসুদেব' শক্তি। ঈশ্বরেরই সেই শক্তি ; আগেই তা তিনি দিয়ে রেখেছেন। কিছুটা দিয়েছেন। কিছুটা হাতে রেখে দিয়েছেন। এই যে দেব-দত্ত শক্তি তাকে আমরা স্ব-শক্তি মনে করি। এখানেই হয় ভুল। বস্তুত তা ঈশ্বরের শক্তি। এর উল্টো দৃষ্টিতে, ঈশ্বর যে শক্তি হাতে রেখেছেন তা-ও আমাদেরই। প্রাপ্ত শক্তির পুরোপুরি ব্যবহারান্তেই কেবল অপর শক্তি যাচ্ঞা করার অধিকার জন্মে।

৪৪. প্রাপ্ত শক্তির পুরোপুরি ব্যবহার করার পরে ঈশ্বরের কাছে আরও শক্তি চাওয়ার অধিকার জন্মে

যে শক্তি পেয়েছি তার পুরোপুরি ব্যবহার না করি ত হাতে-রাখা অবশিষ্ট শক্তি ঈশ্বর আমাদের দেনই বা কি করে? পুত্রকে বাবা ব্যবসায়ের জন্য দশ হাজার টাকার পুঁজি দিয়েছে। তা যদি সে কাজে না লাগায় ত লাখ টাকার পুঁজি তাকে দেবে কি করে? সেই পুঁজির উত্তম নিয়োগ হয়েছে দেখতে পেলে বাবা বলে, "বাকী সব তোমারই!" আমাদের আর ঈশ্বরের সম্বন্ধ এরূপই বটে। হাতে-রাখা সবটা শক্তি আমাদের দিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তৈরি হয়ে আছেন। চাই কেবল আবশ্যকতার প্রমাণ। প্রাপ্ত শক্তির ব্যবহার করে যখন কেউ দেখিয়ে দেয় যে এবার ঈশ্বরের সব শক্তি তার চাই ত তাতে ঈশ্বরের আনন্দই হয়। তখন তিনি বলেন, "এমন উদ্‌যোগী ভক্তই ত আমি চাই।" কিন্তু ঈশ্বরের সব শক্তি দরকার হয়েছে এরূপ কোন কার্য সংসারে কখনও উপস্থিত হয় নি। তাই যতটা শক্তির আবশ্যকতা মানুষ সপ্রমাণ করে ততটা শক্তি ঈশ্বরের কাছ হতে সে সহজেই লাভ করে। মানুষের কখনও নিরাশ

হওয়ার কিংবা হার মানার পালা আসে না। যে শক্তি আছে তার সবটা নিয়োগ করার পরে আরও বেশী শক্তি সে পাবে। নিজ শক্তি পুরোপুরি ব্যবহার না করে ভগবানের কাছে সাহায্য চাইলে তা তিনি দেবেন কেন? কেরামতি দেখিয়ে নিজের কীতি বাড়াবার প্রয়োজন তাঁর নাই। তাঁর কীতি পুরো হতে বাকী আছে কি? তা ষোল আনা পূর্ণ। তোমার বৈভব ও যশ বাড়াতে তিনি ব্যগ্র। নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করে তুমি প্রযত্ন করতে থাক। যখন দেখবে আর পারছ না তখন ঈশ্বরের শরণ লও। তিনি তোমায় আরও বল দেবেন।

৪৫. গজেন্দ্র মোক্ষের অহংকার নাশের দৃষ্টান্ত

ভক্তি মার্গে গজেন্দ্র-মোক্ষের উদাহরণ দেওয়ার রীতি চলে এসেছে। কাহিনীটি এই: গজেন্দ্র প্রথমে আত্মসামর্থ্যে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করেছিল তাই ভগবান তার সহায়তায় অগ্রসর হন নাই। নিজ শক্তির অহংকার তার ছিল। গজেন্দ্রের নিজ শক্তির অহংকার ছিল বলে তার অহংকার দূর না হওয়া পর্যন্ত ভগবান তাকে সাহায্য করেন নাই। তা ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু এমন এক গজেন্দ্রের কথা ধরুন যার নিজ শক্তির অহংকার নাই। আরও ধরুন, সে নিজ শক্তি প্রয়োগ না করে ভগবানের সহায়তা চাইছে। নিজ শক্তি ব্যবহার না করার এই যে জেদ তা ত অহংকারই বটে। নিজেতে যে শক্তি আছে তা সে কাজে লাগাবে না কেন? সে শক্তি কি তার নিজের? মোটেই নয়। তাও ত ভগবানেরই শক্তি। আমার শক্তি তাঁরই শক্তি এই ভাব হতে স্বশক্তির ব্যবহার অহংকার নয়। বরং আপনাতে যে বল রয়েছে তা ব্যবহার না করাই হচ্ছে অহংকারের, আলস্যের, অবিশ্বাসের পরিচায়ক। যে শক্তি তোমার নয় তা তুমি জমা করে রাখছ, আর ভগবানের সাহায্য চাইছ। তোমাতে

ভগবানের যে শক্তি রয়েছে, নিরহংকার হয়ে তা তুমি পুরোপুরি কাজে লাগাও আর তারপরে আরও শক্তি চাও। যে শক্তি আছে তার পূর্ণ ব্যবহার কর ত যে শক্তি নাই তা ঈশ্বর নিশ্চয় দেবেন।

৪৬. ঈশ্বর-শরণতা পরাধীনতা নয়

কিন্তু এখানেও ত শেষটায় ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই এও আসলে পরাধীনতাই বটে, একথা কেউ বলতে পারে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ ওরূপ বললে নিজের শক্তি শেষ হয়ে যায় আর তখনই পরাধীনতা আসে। কিন্তু ঈশ্বরেব শক্তির আশ্রয় লওয়া বস্তুত পরাধীনতা নয়। ঈশ্বরকে পর মনে করলে তা পরাধীনতা হবে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কোটের পকেটটাকে ভিতর-বার দুই ভাগে বিভক্ত করলেন আর এই দুই ভাগেই পয়সা রাখলেন। বাইরের দিককার পয়সা খরচ হয়ে গেল, তখন ভিতরের দিককার পয়সা বার করলেন। পকেটের দুই দিকই আপনার। কিংবা আপনার কিছু টাকা নিজ ট্রাঙ্কে আছে আর কিছু আছে ব্যাঙ্কে। এও তেমন। ঈশ্বর ও আমরা সেই একই চৈতন্যের রূপ। আমরা অংশ মাত্র। ঈশ্বর সেই চৈতন্যের পূর্ণ রূপ। তা হলেও চৈতন্য সেই একই। অতএব তার শক্তি, তাও আমাদেরই শক্তি। সেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি চাওয়া ও পাওয়া পরাধীনতা নয়।

দুই

৪৭. স্থূল সাংসারিক ব্যাপার ঈশ্বরের সহায়তার বিষয় নয়

মনো-নিরোধের আমাদের প্রযত্নের যেখানে শেষ সেখানে ভক্তির আরম্ভ। তখনই তার আবশ্যকতাও উৎপন্ন হয়—এ আমরা দেখেছি।

নিজ চেষ্টায় যখন আর পারা যায় না তখন সাহায্যের জন্য মন ব্যাকুল হয়। আর সে ব্যাকুলতা থেকে ভক্তির জন্ম হয়। তার আগে ব্যাকুলতা থাকে না। ভক্তিও তাই থাকে না। বিশ্বাস থাকতে পারে। নিজ শক্তি ব্যবহার করে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ মানাও। বিষয় থেকে বিযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ যখন মনের ওপর আক্রমণ চালাবে তখন সেই সূক্ষ্ম আক্রমণের প্রতিকারের জন্য ঈশ্বরের সহায়তা চাইবে। এরূপ সূক্ষ্ম ও পবিত্র কার্যে ঈশ্বরের সহায়তা যাচ্ঞা করার নাম আস্তিকতা। সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারে ভগবানের সহায়তা চাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই সব অজ্ঞানকে আমরা আস্তিকতা মনে করি। বাস্তবিক পক্ষে তা আস্তিকতা নয়। পরীক্ষা পাস করার জন্য ঈশ্বরের সহায়তা যাচ্ঞা করা কিরূপ আস্তিকতা? এ ত ছেলেমানুষি। পুরুষার্থহীনতা। ক্ষেতে ফসল ভাল হয় নাই ত চাও ঈশ্বরের সহায়তা! এ সকল প্রশ্ন সমাধানের শক্তি ঈশ্বর যেন আমাদের দেন নাই! এ সব ঈশ্বরের সহায়তার বিষয়ই নয়। সকাম ভাবনা থেকে বাহ্য কার্যে ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া শোভন নয়।

৪৮. ঈশ্বরের কাছে চাওয়া—চাওয়ার যোগ্য রীত

যুদ্ধে আমাদের জয়ী কর—দুই পক্ষই এরূপ প্রার্থনা করে। ঈশ্বর বেচারার নিজেরও ত ইচ্ছা আছে। উভয়কে বিজয়ী করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমি তাঁকে আমার ইচ্ছার দাস মনে করি। আমার ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁর দৈবীশক্তি ব্যবহার করুন এই হচ্ছে আমার কামনা। নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার অনুকূল করে নেওয়া হচ্ছে আস্তিকতা। কিন্তু আমি করি তার বিপরীত। আমার জয় হোক, আমার এই ইচ্ছা আমি ঠিকই করে রেখেছি। তাঁর কাছ থেকে চাইছি মাত্র সাফল্য। বস্তুতপক্ষে আমার প্রার্থনা ত হওয়া চাই

এইরূপ : আমার পক্ষ যদি ন্যায়ের পক্ষ হয় ত তার জয় হোক, নতুবা হোক তার পরাজয়। আমার বুদ্ধি ত তাতে শুদ্ধ হবে। মহাভারতের একটি আখ্যায়িকায় আছে : অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিবশত গান্ধারী চোখে পটি বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র দুর্যোধন যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁকে প্রণাম করতে আসেন। তিনি এই বলে তাকে আশীর্বাদ করেন—সৎপথ আশ্রয় করে থাক ত তোমার জয় হোক! —এর নাম যথার্থ প্রার্থনা। ভগবান, আমার হারিয়ে যাওয়া জিনিস আমায় পাইয়ে দাও—এরূপ প্রার্থনা কেন করবেন? জিনিস পাওয়া যাক বা না যাক আমার শান্তি যেন না টলে—প্রার্থনা ত হওয়া চাই এই। ছেলের অসুখ করলে যাচ্ঞা করা হয়—আমার ছেলে যেন না মরে—ভাল, এ কিরূপ প্রার্থনা? মানুষ এক দিন না একদিন মরবে এ ত জানা কথা। এখন যেন না মরে এই প্রার্থনা করতে হয় ত অমুক সময় মরে ত আপত্তি নাই, এরূপ ত বল। এখন না মরে, ২৮শে তারিখ যেন মরে, এরূপ নিশ্চিত প্রার্থনা ভগবানের কাছে কর। কিন্তু এরূপ যাচ্ঞা কে করে? তাই ছেলে যদি মরবেই ত মরুক, কিন্তু মরার সময় তার যেন মানসিক ব্যাকুলতা না হয়, এরূপ যাচ্ঞা কর।

৪৯. আমার পক্ষে ভাল কি তা এক ঈশ্বরই জানেন তাই সকাম প্রার্থনা করতে নাই

এই আমার পক্ষে ভাল এরূপ আমরা আগেই ঠিক করে ফেলি আর তারপরে ভগবানের কাছে সহায়তা চাই। এর অর্থ এই যে ভগবানকে আপনি আপনার বুদ্ধির গোলাম বানাতে চান। উপনিষদে একটি গল্প আছে। কোন লোকের উপর ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবান তাকে বললেন, 'বর চাও', সে বলল, 'ভগবান সে বিষয়ে আমি

কি জানি? আমার পক্ষে ভাল কি, সে জ্ঞান আমার কোথায়? তুমিই সব জান। আমার পক্ষে যা ভাল তা তুমি দাও'। সে ভক্ত পরীক্ষায় পাস হয়ে গেল। ঐটেই ছিল যথার্থ পরীক্ষার সময়। সে সময়ে সে নিজে নির্ণয় করে সেটা ভগবানের উপর চাপাতে প্রযত্ন করে নাই। আমার বুদ্ধি অনুসারে ভগবান যে চলতে প্রস্তুত নন, এতেই আমার কল্যাণ। আমার বুদ্ধি অনুসারে চলতে প্রস্তুত হয়ে যান ত নিশ্চয় বুঝবেন যে আমার অকল্যাণ করে তিনি আমাকে বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা দিতে চান। আমরা নিজ বুদ্ধিকে প্রমাণ মনে করি আর সে বুদ্ধি অনুসারে ভগবান চলুন, এরূপ আশা করি। এর অর্থ এই যে, পরমেশ্বরকে আমরা আমাদের আদেশ অনুসারে চলার ভৃত্য মনে করি। শক্তিশালী ত বটেনই, কিন্তু ভৃত্যই। নির্ণয় করার, বিচার করার অধিকার তাঁর নাই। আমরা বিচারকর্তা, নির্ণয়কর্তা। আমরা 'বিধিমণ্ডল' আর তিনি হচ্ছেন সেরেফ তামিলকারী মহকুমা-হাকিম। ভগবানকে জড় উপকরণরূপে ব্যবহার করতে যাওয়া জড়তার লক্ষণ; অহংকার ত বটেই। এতে ভগবানের অবমাননা রয়েছে, রয়েছে নাস্তিকতা। ভক্তির নামে এই জড়তার ভাগ সকল ধর্মেই ঢুকে গেছে। সকাম কর্মে ভগবানের সহায়তা ভিক্ষা করা ভক্তির লক্ষণ নয়। তাই স্থানে স্থানে গীতা সকামতার উপর আঘাত করেছে। সকামতার সহিত গীতার যেন চিরবৈর।

৫০. শর্ত-সাপেক্ষ সকাম ভক্তিও গ্রাহ্য

কিন্তু কোথাও কোথাও দয়াভাব হতে গীতা একথাও বলেছে যে সকাম-ভাব থেকেও যদি ভক্ত আমার শরণ নেয় ত তাকে আমি ফল দিই। ততটা পর্যন্ত কামনা আমি তার পূর্ণ করি। কিন্তু তা দয়াভাব থেকে দেওয়া আশ্বাসন মাত্র। তা কিছু বিধি নয়। হিত যে চায়

তাকে নিষ্কাম ভাবনা হতেই শরণ নিতে হবে। সকাম ভাবনা থেকে যে শরণ নেয় তাকেও ফলের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। সকাম প্রার্থনার অনুমোদন তা কোন মতেই নয়। সকামতা থেকেও যদি কেউ অনন্য-ভাবে ঈশ্বরের শরণ নেয় ত খুব হল,—এরূপ করুণার ভাব এতে ব্যক্ত হয়েছে। সকামতায় মূঢ়তা ত আছেই, অবনতির আশঙ্কাও আছে। কিন্তু অনন্যভাব থাকলে উন্নতির অবসরও আছে। তার অর্থ এই যে সকামতা দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনন্যভাব হতে ব্যাকুল ভক্তিভরে সকাম প্রার্থনা কর ত ঈশ্বরের স্পর্শে বৃত্তি শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণত অনন্যভাব হতে লোকে সকাম প্রার্থনা করে না। না করে সে পুরো অবিশ্বাস, না করে পুরো বিশ্বাস। অসুখ হলে এদিকে ডাক্তারের পায়ে পড়ে, ওদিকে ব্রাহ্মণ ডেকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে। তার বিশ্বাস দোলায়মান, পুরুষার্থ পঙ্গুপ্রায়। এরূপ দুর্বল বিশ্বাসের হেতু মানুষ অধঃপাতে যায়। সকামতা নিম্নস্তরের সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে অনন্যভক্তির যোগ হলে তা চলনসই হয়ে যাবে। অনন্য-নিষ্ঠার ফলে সকামতাও পাবন হবে। বস্তুতপক্ষে নিষ্কামতা ও অনন্যতার যোগই কাম্য।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান

এক

৫১. এতাবৎ আলোচনার সারাংশ : যতত্+বিপশ্চিত্+মত্পর=স্থিতপ্রজ্ঞ

ইন্দ্রিয়-নিরোধের কার্য যতটাই স্থূল হোক, সাধকের স্ব-শক্তি-বশে করে নিতে হবে। কিন্তু তার দ্বারাই অর্থাৎ স্থূল নিগ্রহের দ্বারাই ইন্দ্রিয়জয় পুরো হয় না। মনের রস মরা চাই। দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়-সমূহ যখন মনের ওপর হামলা চালায় তখন মানুষের আয়ত্তাধীন দুই শক্তিতে—যাকে আমরা জ্ঞান ও তিতিক্ষা বলেছি—কুলোয় না। এই দুই শক্তিকে বিবেক ও বৈরাগ্য বলে। ইন্দ্রিয়কে কখন নিগ্রহ করতে হবে আর কখন সংযমে বাঁধতে হবে তা নির্ণয়ের শক্তিকে বিবেক বলা হয়। কখন নিগ্রহের আর কখন সংযমের আশ্রয় নিতে হবে বিবেক দ্বারা তা ঠিক করে নিয়ে তদনুসারে কাজ করার শক্তির নাম বৈরাগ্য। কিন্তু এভাবে বিবেক-বৈরাগ্য-পূর্বক ইন্দ্রিয়-নিরোধের প্রযত্ন করার পরেও রসের রেশ থেকে যায়। রস-নিবৃত্তি করতে চাও ত মৎপরায়ণ হও, একথা বলেছেন। বিবেক ও বৈরাগ্য এই দুই শক্তি কাজে লাগানোর পরে এবং কাজে লাগাতে লাগাতে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে থাক। এরূপে তিন শ্লোকে ইন্দ্রিয়জয়ের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সাধনা সামনে ধরা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা কামনামুক্তি সাধাই ইন্দ্রিয়-জয়ের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা। তিন বিশেষণ দিয়ে এই তিন রকম সাধনা দেখানো হয়েছে।

যতত্, বিপশ্চিত্, মৎপর—গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ এই তিন বিশেষণের যোগফল। এভাবে ইন্দ্রিয়-নিরোধের বিজ্ঞানসূচক এই তিন শ্লোকের ত্রিক এখানে শেষ হল।

৫২. ঈশ্বর-পরায়ণতা—নিজেই স্বতন্ত্র ধ্যেয়

কিন্তু শ্লোকের ভাষার যে অর্থ এখন পর্যন্ত এখানে করেছি তার চাইতে ঐ ভাষা আরও বেশী অর্থপূর্ণ। ইন্দ্রিয়নিরোধের কাজে মানুষের দুই শক্তি পর্যাপ্ত নয়। তাই তা পূর্ণ করার জন্য সাধক ঈশ্বর-পরায়ণ হবে, এইটুকুই কেবল এখানে বলা হয়েছে তা নয়। বলা হয়েছে যে সাধ্যে যতটা কুলোয় বিচারপূর্বক ততটা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করে ঈশ্বর-পরায়ণ হও। তার অর্থ ঈশ্বর-পরায়ণতা নিজেই স্বতন্ত্র ধ্যেয়—এখানে ভাষার অর্থ এতটাই গভীর। আর শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই অর্থ ঠিকও বটে। তা কেন তা এবার দেখতে হবে।

৫৩. ধ্যেয় বিধায়ক হওয়া চাই

মনের ওপর ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ চলে ত সাধক মনের দোষ দূর করে দেওয়ার প্রযত্ন করতে থাকে। কিন্তু মনের বিকার দূর করতে হবে, দূর করতে হবে, দূর করতে হবে, অনুক্ষণ এরূপ জপতে থাকলে বিকার মন থেকে দূর না হয়ে উল্টে আরও আড্ডা গেড়ে বসে। কারণ, সেই চিন্তাই মনে পাক খেতে থাকে। একে বিরোধী ভক্তি বলা হয়। হলই বা দুর্জনতার প্রতিকারের নিমিত্তে, চিন্তা করতে করতে চিত্তে সেই দুর্জনতাই জন্মে। বিরোধী চিন্তায় বিকার শেষ হয় না, উল্টো শিকড় গেড়ে বসে। ভাগবত বলে বিরোধী-চিন্তনের ফলে কংস কৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিল।

দেখা গিয়েছে যে নিছক নিষেধক সাধনার ফলে মানুষ বিকারের শিকার হয়। মন থেকে বিষয়-রস দূর করে দেব এরূপ নিষেধক সাধ্য সামনে রাখলে নিষেধক সাধন লাভ হয়। তাই চোখের সামনে কোন বিধায়ক ধ্যেয় ও তদনুকূল বিধায়ক সাধন থাকা চাই। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির ব্যাকুলতা সেই বিধায়ক ধ্যেয়।

৫৪. ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ঈশ্বর-পরায়ণতা সেই বিধায়ক ধ্যেয়

ব্রহ্মতে তন্ময় হওয়ার অর্থাৎ ঈশ্বর-পরায়ণ হওয়ার প্রযত্ন করাই সেই বিধায়ক সাধনা। একেই ব্রহ্মচয বলে। বৃত্তিসমূহের ব্রহ্মের তথা ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্য হওয়া চাই। ব্রহ্মচর্য মানে কেবল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নয়। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কিছু স্বতন্ত্র বা অন্তিম সাধ্য নয়। লক্ষ্য হচ্ছে প্রজ্ঞা স্থির করা। কিন্তু প্রজ্ঞা স্থির করতে হবে মানে কোথাও স্থির করতে হবে ত? সকল দিক থেকে গুটিয়ে তাকে কোন স্থানে স্থির করতে হবে? তাকে স্থির করার ঠাই চাই ত? এর উত্তর, ঈশ্বরে তা স্থির করতে হবে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের জন্য মৎপরায়ণ হও, কামনা-নিবৃত্তির জন্য মৎপরায়ণ হও, এখানে এরূপ বলা হয়নি। এ ত নিষেধক অর্থ। পূর্ণ অর্থ নয়। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে মৎপরায়ণ হও এরূপ বিধায়ক অর্থ এ বাক্যে রয়েছে। কামনা বাইরে থেকে নিবৃত্ত হয়েছে ত তাদের আবার থাকবার জায়গা কিরূপ? আত্মাই সে জায়গা। সে আত্মাই এখানে মৎপরায়ণ শব্দ দ্বারা সূচিত হয়েছে। কামনার অবলম্বন দূর করে দেন ত মন নিরালম্ব ও রিক্ত হবে। সে অবস্থায় তা বেশীদিন থাকতে পারে না। তাই তাকে ঈশ্বরের আধার দিয়ে ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা ভরে দেওয়া চাই। ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয় ত তার ওপর ইন্দ্রিয়ের আক্রমণের প্রশ্নই থাকে না।

৫৫. ঈশ্বর-ভক্তির জন্যই ঈশ্বর-ভক্তি

আগেই বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়-নিরোধের পূর্ণতার জন্য ঈশ্বর-ভক্তির সাহায্য নেওয়া ঠিকই বটে। কিন্তু সেই কথাও পূর্ণ নয়। কারণ, পরে দেখা গিয়েছে যে ঈশ্বর-ভক্তি কোন কিছুর সাধন নয়, তা নিজেই স্বয়ংভূ সাধ্য। ঈশ্বর-ভক্তি কোন অবান্তর উদ্দেশ্যের জন্য নয়। ঈশ্বর-ভক্তির জন্যই ঈশ্বর-ভক্তি। কলার জন্য কলা, বিদ্যার জন্য বিদ্যা, জ্ঞানের জন্য জ্ঞান, এরূপ কথা আমরা আজকাল শুনতে পাই। কিন্তু একথা বিচারসহ নয়। সাংখ্য এই বিষয়ের মীমাংসা কবেই করে রেখেছে। জড় বস্তু নিজের জন্য তিষ্ঠাতেই পারে না। প্রকৃতিও প্রকৃতির জন্য নয়। প্রকৃতি পুরুষের জন্য। কলা, আত্মার জন্য। বিদ্যা ও জ্ঞান আমার জন্য। জড়ের জন্য জড় এই কথাটাই ভুল। অন্য সব বিষয়ে এই কথা ভুল হলেও ঈশ্বর-ভক্তি সম্পর্কে সত্য। ঈশ্বর-ভক্তির জন্যই ঈশ্বর-ভক্তি এই কথা অসত্য নয়। কারণ ঈশ্বর জড় বস্তু নয়, বাহ্য বস্তু নয়, তা আমারই পরিশুদ্ধ রূপ। এক ঈশ্বর-ভক্তিই ধ্যেয়। বাকী সব কামনা ও সাধনা তদর্থে, এইটেই ত হওয়া চাই।

৫৬. ভক্তের ভূমিকা প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিদের ন্যায়

রোগ হয়েছে। তা ভাল করার চেষ্টা চলছে। রোগ কেন সারা চাই? আরোগ্যলাভ কিছু স্বতন্ত্র ধ্যেয় নয়। ধ্যেয় আত্ম-কল্যাণ। আত্ম-কল্যাণের জন্য সেরে ওঠা আবশ্যক হয় ত সেই সেরে ওঠা ইষ্টের। আত্ম-কল্যাণের জন্য সেরে না ওঠা দরকার হয় ত সেরে না ওঠাই ইষ্টের। একদিন কোন শাস্ত্রজ্ঞের সহিত কথা হচ্ছিল। তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনাদের

শাস্ত্রমতে সব রোগীই কি ভাল হয়?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের শাস্ত্রমতে সব রোগী ভাল হয় না, সব রোগ ভাল হয়।" তাঁর কথা ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর পদ্ধতিতে যে রোগী মরার, মরে। কিন্তু মরে শান্তিতে। ভাল হওয়ার রোগী ভাল হয়। সেও শান্তিতেই ভাল হয়। এখানেও তেমন, ভক্তের ভূমিকা প্রাকৃতিক চিকিৎসকের ন্যায়। সে বলে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে আমার আত্মোন্নতির জন্য রোগ সারা ইষ্টের হয়ত সারুক। তাঁর ব্যবস্থামতে আত্মোন্নতির জন্য রোগ না সারা ইষ্টের হয় ত না যেন সারে।" সকল অবান্তর নির্ণয়ের ভার ভগবানে সঁপে সে মুক্ত হয়। তার বুদ্ধি একটি নির্ণয়ই করে রেখেছে। আত্মোন্নতি চাই, ঈশ্বর-ভক্তি চাই এইটেই সে জানে। বাকী আর কিছু সে জানে না। সব কিছু বাহ্য কর্ম সে ঈশ্বরভক্তি-লাভের জন্য করে। কোনও বাহ্য কর্মের জন্য সে ঈশ্বর-ভক্তিকে এক্সপ্লয়েট করতে, লুণ্ঠন করতে চায় না।

দুই

৫৭. অনন্যতা সকামতাকে পর্যন্ত বাঁচায়

কিন্তু গৌণ হলেও এবং অনন্যতাসাপেক্ষ হলেও গীতা সকাম ভক্তিকে স্থান দিয়েছে—কেন দিয়েছে? এই প্রশ্ন এখানে ওঠা স্বাভাবিক। উত্তর এই—কেউ যদি কামনা-পূর্তির জন্যও সকল অবান্তর আশ্রয় ছেড়ে, অনন্য-মনে এক ঈশ্বরের শরণ নেয় ত, ধরতে হবে সে উত্তম নির্ণয় করেছে। অন্য সকল আশ্রয় ছাড়া ও একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা, এটা কিছু তুচ্ছ নির্ণয় নয়। তাই সকামতা গৌণ হলেও এই নিশ্চয় আত্মোন্নতির সাধক। পরে নবম অধ্যায়ে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে যে

এরূপ অনন্যভাবে আমার ভজনা যে করে সে যদি একান্ত দুরাচারীও হয়, তবুও অবিলম্বে তার ভাবনা শুদ্ধ হয়। "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা" অবিলম্বেই সে ধর্মাত্মা হয়। অনন্যতার এমনই সামর্থ্য। রোগ হয়েছে। ভাল হওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু দাও সব ভার ঠাকুরের উপর চাপিয়ে। না ডাক্তার, না বদ্যি। পথ্য পর্যন্ত ত্যাগ। "ঠাকুর আমায় ভাল করে দে" বলে অনন্যমনে তাঁর আশ্রয় নিলে। তার বিশ্বাস দেখে ঈশ্বর তাকে ভাল করবে, কিংবা প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। অন্য এক দৃষ্টিতে, লোকের হয়ত মনে হবে, তার কামনা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু ঈশ্বরের উপর অনন্যশ্রদ্ধাহেতু ভক্তের মনে হবে, আমার অশেষ কল্যাণ হয়েছে।

৫৮. সুদামদেবের দৃষ্টান্ত

এই প্রসঙ্গে সুদামদেবের দৃষ্টান্ত উত্তম হবে। ঘোর দারিদ্র্য। মহা কষ্ট। পত্নী বললেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাও। কিছু না দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। আঁচলে দুইটি চিঁড়া বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। তা পর্যন্ত খুইয়ে খালি হাতে ফিরে চলেছেন। কিন্তু মনে আনন্দ। "স্ত্রী সকামভাব থেকে আমায় ভগবানের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু মাধব কেমন দয়ালু! তিনি আমার অসঙ্গত কামনা পূর্ণ করেন নি"—এভাবে নিজ ভক্তি দৃঢ় করতে করতে গাঁয়ে ফিরে গেলেন। দেখেন, সারা গাঁ সোনার হয়ে গেছে! বলেন, "ঠাকুরের এ কত বড় কৃপা, গোটা গ্রামটাই তিনি সোনার করে রেখেছেন। আমার তুচ্ছ সুখভোগের জন্য এ মোটেই নয়। ভগবান দিয়েছেন। এখন তা জনসেবায় লাগাব।" ভগবান দেন ত তাঁর কৃপা। না দেন ত তাও তাঁর কৃপা। ভক্তের মহত্ব এইরূপ অনন্যভাবনায়।

৫৯. ভক্ত সব কিছুতে ভগবানের কৃপা দেখে

একনাথকে ভগবান মনের মত স্ত্রী দিয়েছিলেন। মনে মনে তিনি বললেন, "ভগবানের কত কৃপা আমার ওপর! তার সহায়তায় আমার শীঘ্র ঈশ্বর মিলবে।" তুকারামের স্ত্রী মনের মত হল না। তিনি বললেন, "আমার ওপর ঈশ্বরের কত কৃপা, আমায় তিনি মনোমত স্ত্রী দেন নাই। নয়ত সংসারে আমি আসক্ত হয়ে যেতাম।" মনের মত স্ত্রী মেলে ত কৃপা। মনের মত না হয় তবুও কৃপা। আদৌ না মেলে ত তাও কৃপা। মিলেছিল, মরে গেছে সেও কৃপা।

"বাঈল গেলী মুক্ত ঝালী, দেবেং মায়া সোডবিলী।
বিঠো তুঝেং মাঝেং রাজ্য।"*

"ভগবান, তোর ও আমার মধ্যে যে পর্দা ছিল তা এখন দূর হয়ে গেছে। দুইয়ের একছত্র রাজ্য হযেছে," ভক্ত এভাবে সর্ব বস্তুতে ভগবানের কৃপা দেখে। অনন্যভক্তের ভূমিকার এই হচ্ছে মহত্ত্ব।

৬০. অনন্যভক্তের সকামতা মানেই ব্যাপক সদ্‌ভাবনা : একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত

কামনা-পূর্বক কিন্তু অনন্যভাবে কৃত ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দেশ্য গৌণ হলেও অথবা গৌণ মনে হলেও অনন্যতার কারণে ভগবানের কৃপায় চিত্তশুদ্ধি হয়; কিংবা অন্য কথায় বললে, সকামতা গিয়ে নিষ্কামতা আসে; অথবা আরও অন্যভাবে বলেন ত, সকামতাই নিষ্কাম হয়ে যায়। সংক্ষেপে বললে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন ত অনন্যতার সাথে যুক্ত সকামতা সংকুচিত

---

* স্ত্রী গেছে হয়েছি মুক্ত, দেব কেটেছেন মায়াজাল।
বিঠো এবে তোতে মোতে রাজ্য অখণ্ড॥

সকামতা নহে, তাহা বস্তুত ব্যাপক সদ্‌ভাবনা। এর বড় উদাহরণ না দিয়ে ছোট একটি ঘরোয়া উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন, ঈশ্বরের প্রতি কোন স্ত্রীলোকের অনন্যভক্তি। তার নথ খোয়া গেছে। ধরে নিন, তা সে ফিরে পেতে চায়। সে বলছে কি না, "ঠাকুর আমার নথ পাইয়ে দে। তোর ভক্তিতে আমি এতটুকু কম রাখিনি। তবু আমার নথ খোয়া গেল কেন? আর কারো তা নেওয়ারই বা ইচ্ছা হল কেন? তা আমি এখন খুঁজে মরব না। পুলিশেও জানাব না। কারো প্রতি সন্দেহও করছি না। যে নিয়েছে তাকে তুই সদ্‌ভাবনা দে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। মেলে ত আমি মিষ্টি বিতরণ করব। যে নিয়েছিল তাকে তার অর্ধেক দেব। তার প্রতি তুচ্ছ ভাব মনে রাখব না। আরও বেশী মন দিয়ে তোর ভক্তি করব। তাকে যদি তুই সে বুদ্ধি না দিস ত তার ওপর রাগ করব না। রাগ করব তোর ওপর। আর রাগ করেছি বলে আগের চাইতে আরও বেশী ভক্তি করব। যা, তোর যা করার তা তুই কর গে।" অনন্যভক্তি ও সকামতা এই দুইয়ের কথা এক সাথে ভাবলে এতটা গভীর অর্থই এই দুইয়ের পাওয়া যায়। এই কল্পিত নারীর নথ-বিষয়ক কামনা আসলে কি? জগতে চুরি করার প্রবৃত্তি না থাকে, সংসারের বাসনা শুদ্ধ থাকে—এই না ঐ কামনার অর্থ? এটুকু হয়েছে ত বস্, ঈশ্বর তাকে নথ পাইয়ে দিলেন, কি দিলেন না তা ঈশ্বরের মর্জির ওপর থাকছে। তাঁর বিধানে যা ঠিক তা তিনি করবেন। তাঁর বিধান ঠিক হয়েই আছে, কিন্তু তা আমরা জানি না। তা যদি জানবই তবে আমরাই ঈশ্বর হয়ে যাই না কি? তাঁর বিধান যাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই ঐ নারীর ত ভক্তি করতে হবেই। অনন্যভক্তি ও সকামতা এই দুইয়ের যোগে কি যে নিষ্পন্ন হয় এই উদাহরণ হতে তা বোঝা যাবে।

তিন

৬১. ঈশ্বর-পরায়ণতাই মুখ্য বস্তু। বাসনাকেও ঈশ্বর-পরায়ণ কর

এই সবের তাৎপর্য এই যে অবান্তর কামনা ত কোন ছার, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ সাধনাও গৌণ ; ঈশ্বর-পরায়ণতাই মুখ্য বস্তু। "মৎপরায়ণ হও এবং বিষয়-রসে মজো না, বস্, তাহলেই হল। তাহলেই তোমার সকল বাসনা ধুয়ে-মুছে যাবে।" সংক্ষেপে এই হচ্ছে গীতার সুস্পষ্ট কথন। চিত্তে বাসনা জাগে, কিন্তু তদনুকূল বাহ্য কর্ম হতে দিও না, তবেই হল। বাসনানুকূল কার্য করলে বাসনা কায়েম হয়ে বসে। তাই তা করবে না। কিন্তু সাধক বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করেছে বলেই তার চিত্তের বাসনা দূর হয়ে গেছে তা নয়। অর্থাৎ অন্তরে তা ধূমায়িত হতে থাকে, তাকে জ্বালাতন করতে থাকে। তার চিত্তকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। তবে সে করবে কি ? সেই বাসনাকেই সে ঈশ্বরার্পণ করে দেবে, একথাই বলা হয়েছে। নাথ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার চিত্তে যে সব বাসনা জাগবে সে সব যেন তোরই রূপ ধরে।" এরূপে সকল বাসনার রূপান্তর ঘটে। বাসনা ঈশ্বরময় হয়। ভক্তির হেতু তা দিন দিন উন্নত হতে থাকে।

৬২. বাসনা আসলে খারাপ নয়। ঈশ্বর-পরায়ণতা দ্বারা তার রূপান্তর ঘটে

বস্তুত কোন মানুষেরই আসলে মন্দ বাসনা থাকে না। এই কথাটা সে নিজেই জানে না। অন্যেও জানে না। বাহ্য বস্তু লাভের জন্য তাকে দৌড়ঝাপ করতে দেখা যায়। সকল বাহ্য সৃষ্টি তার হোক এই জন্যই তার

এই প্রযত্ন। সময় সময় নিষিদ্ধ বস্তু লাভের জন্যও তাকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। বস্তুত এই সবই দেহপ্রাচীরে আবদ্ধ আত্মার ব্যাপক হওয়ার ব্যাকুলতা। নিজের দৃষ্টি অনুসারে বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে সে একরূপ হতে চায়। ঐ শরীরের সংকুচিত পরিধিতে তার সোয়াস্তি নাই। মদখোর মদ খায়—এর মূলেও ঐ অস্থিরতা। ভক্তি-মার্গ ঐ মদখোরকে বলবে, "তুই বাইরের তুচ্ছ মদ-খাওয়া বন্ধ কর। ভগবানকে তোর মদ বানিয়ে নে। তার ভক্তি-শরাব পান কর।" ওমর খয়ামের 'রূবায়া'-তে এর রূপ দেখতে পাই। "বাসো যথা পরিকৃতং মদিরা-মদান্ধঃ" সেই ভক্তি-সুরার পেয়ালা থেকে এই স্থিতি আসে। এভাবে ভগবানকে বাসনা অর্পণ করলে তা দিব্য রূপ ধরে। তাই ভগবান বলছেন, মৎপরায়ণ হও। চিত্তে বিষয়বাসনা আসে ত ঘাবড়াবে না। কেবল বিষয়ভোগের ফেরে পড়ো না। বাসনা ঈশ্বর-পূজায় লাগিয়ে দাও। কাম-ক্রোধও তার পূজায় লাগাও। সে স্থলে ঐ বিকারের ও তোমার বাসনার রূপান্তর ঘটবেই। আর পরে চিত্তের বিকার শান্ত হয়ে প্রজ্ঞা স্থির হবে।

৬৩. নিষ্কামতা, অনন্যতা ও ঈশ্বর-ভাবনা থাকলে ভৌতিক বিদ্যার উপাসনাও পাবন হতে পারে

এমন কি, ভৌতিক বিদ্যার উপাসনায় যদি নিষ্কামতা, অনন্যতা ও ঈশ্বর-ভাবনা থাকে তবে তা থেকেও চিত্ত-শুদ্ধি হতে পারে। এই দৃষ্টিতে দেখলে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এরূপ ভেদই আর থাকে না। বস্তুতপক্ষে এই ভেদ সত্যও নয়। গণিতোপাসকের কাছে গণিতই ঈশ্বর। অর্থাৎ সেই ভাবনা থেকে যদি তার সাধনা চলে। কোন গণিতজ্ঞের সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি এক অভিনব তত্ত্বের সন্ধান পান। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার যোগ্য সে তত্ত্ব তিনি কাগজে লিখে রাখেন।

পরে সেই নথির সব কাগজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঐ গণিতজ্ঞ শান্ত থাকেন। তাঁর চিত্তে ক্ষোভ দেখা দেয় নাই। একমাত্র গণিত হতে এতটা শান্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বুঝতে হবে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি থেকে তিনি গণিতের উপাসনা করেছিলেন। হতে পারে তিনি ঈশ্বরের নামের ধার ধারতেন না। কিন্তু তার দরুন তাঁর উপাসনাতে ব্যবধান হওয়ার নয়। আমার মত কাটুনি সুতা-কাটায় তন্ময় হবে। অপর কেউ কোন পবিত্র সামাজিক কার্যে তন্ময় হবে। এই এই বিষয় ঈশ্বর-স্বরূপ এই ভাব থেকে যারা উপাসনা করবে তাদের চিত্তের উপর ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ হবার নয়। কেবল ভৌতিক দৃষ্টি থেকে যারা বিজ্ঞানের কিংবা অন্য বিষয়ের সাধনা করে তাদের সিদ্ধি অর্থাৎ সাফল্য লাভ হয় না। কারণ তার সুস্পষ্ট। ভৌতিক বিষয়, সে যাই হোক, আত্মা থেকে আলাদা হয়ে যায়। আত্ম-ভিন্ন অনাত্ম বিষয়ে লীন হওয়ার যতই প্রযত্ন আত্মা করুক, তা কি করে ঘটবে? সেই বিষয়ই যদি ঈশ্বর ভাবনা-ভাবিত হয় তবে আত্মাতে লীন হবার পক্ষে কোন অন্তরায় থাকে না। তাতে সে একেবারে ডুবে যেতে পারে।

সপ্তম ব্যাখ্যান

এক

৬৪. ইন্দ্রিয়-জয়ের তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্তাবনা। বিষয়-চিন্তন থেকে বুদ্ধিনাশ পর্যন্ত ব্যতিরেক পরম্পরা

স্থিত-প্রজ্ঞের একটি লক্ষণ জিতেন্দ্রিয়তা। মধ্যেকার দশ শ্লোকে তার বিস্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে তিন শ্লোকের প্রথম বিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়েছে। তারপরে ইন্দ্রিয়-জয়ের সহিত প্রজ্ঞার কি সম্বন্ধ তা অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথম দুই শ্লোকে ব্যতিরেকমুখে ও পরের দুই শ্লোকে অন্বয়মুখে, স্থিত-প্রজ্ঞার পক্ষে ইন্দ্রিয়-জয়ের আবশ্যকতা দেখানো হয়েছে। এখান থেকে ইন্দ্রিয়-জয়ের তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা আরম্ভ হচ্ছে।

৬৫. বিষয়-চিন্তন থেকে সঙ্গ আর সঙ্গ হতে কাম জন্মে

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্ তেষূপজায়তে"

ইন্দ্রিয়-নিরোধের ধার যে ধাবে না, বিষয়ের ধ্যানে যে মগ্ন, তাকে সেই সেই বিষয়ের সঙ্গ পেয়ে বসে। সঙ্গ মানে সংগতি, পরিচয়। বিষয়ের সঙ্গ পেয়ে বসে মানে বিষয়ের প্রতি টান জন্মে। মন বিষয়ে বাঁধা পড়তে থাকে। তা থেকে কামের উদ্ভব হয়। বিষয়ের ধ্যান, পরে সঙ্গ আর তারপরে কাম, এ হচ্ছে উত্তরোত্তর ক্রম। এই তিন বৃত্তির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। একই বৃত্তির তা তিন রূপ মাত্র। বড়

নদীর উদ্‌গম হতে মুখ (সংগম) পর্যন্ত অনেক নাম, কিন্তু প্রবাহ সেই এক। তদ্রূপ একই বহতা বৃত্তির এই তিন নাম। মাটি ও মাটির তৈরী বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কোথা থেকে আসবে? চিন্তন থেকে বিষয়ের পরিচয় ঘটে অর্থাৎ বিষয় মনে সাকার রূপ ধরতে থাকে। কোন লোক অমনি বন্ধুর আগ্রহে শরাবের দোকানে গেল। ফের বন্ধু ধরে। আবার যায়। বার বার এরূপ চলতে থাকে। এই আকর্ষণের নাম সঙ্গ। পরে তা রমণীয়, সুন্দর, আকর্ষক মনে হয়; তাতে সে রস, মজা, মাধুর্য দেখতে থাকে। এরই নাম কাম। গীতা বলে, এই কাম থেকে পরে ক্রোধ জন্মে। "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।"

৬৬. পরে কাম হতে ক্রোধ জন্মে। এই বিষয়ে ভাষ্যকারদের স্পষ্টীকরণ

এখানে বাস্তবিকই ঠিক দিশে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে এই জায়গায় বিচারকেরা ফাঁপরে পড়েছে। কাম থেকে কি ভাবে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এই প্রশ্ন পেঁচালো হয়ে গেছে। ক্রোধ হতে মোহ, মোহ হতে স্মৃতি-ভ্রংশ, তা থেকে বুদ্ধিনাশ, পরেকার এই ধাপ বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কাম হতে ক্রোধ কি করে উৎপন্ন হয় তা আদৌ স্পষ্ট বোঝা যায় না। শংকরাচার্য তাঁর ভাষ্যে "কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে" এভাবে পথ কেটেছেন। তিনি বলেছেন, কাম প্রতিহত হলে তা থেকে ক্রোধ জন্মে। কিন্তু কাম প্রতিহত না হয় এরূপ উপায় যদি করা যায় তবে ত ক্রোধ উৎপন্ন হওয়ার কথা নয়। তার মানে কাম থেকে ক্রোধ জন্মে এই কথা সব সময়ে সত্য নয়। কামে যদি বাধা সৃষ্টি না হয় ত এই কথা অসার হয়ে যায়। তাই গান্ধীজী এখানে এক পথ বার করেছেন। "কাম কখনই পূর্ণ হয় না"

এই হচ্ছে তাঁর টিপ্পনী। সাধারণভাবে এই যুক্তি ঠিকই। জগতের অনুভব এই যে কাম কখনই পূর্ণ হয় না। বাসনা বেড়েই চলে। তৃপ্তি তাই হয় না। দশ হাজার মিলেছে ত লাখের পিছু মন ছোটে। লাখের পরে দশ লাখ, পরে কোটি চাই। গণিতের সংখ্যার অন্ত নাই। বাসনারও নাই। যযাতির ·উক্তি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে—"আহুতি দিলে যেমন অগ্নি বাড়ে তেমন ভোগ থেকে কাম বেড়েই চলে।" তাই সাধারণভাবে গান্ধীজীর যুক্তি অকাট্য মনে হয়। কিন্তু শংকরাচার্যের যুক্তি আর এই যুক্তি প্রায় একই রূপ। কামনার যদি অন্ত না থাকে তবে কোথাও না কোথাও তাতে বাধা সৃষ্টি হবেই। তা হয়েছে ত ক্রোধ না এসে যায়ই না, এই হচ্ছে শংকরাচার্যের ভাব। গীতায় কামকে 'অনল' বলা হয়েছে। তার 'অলম্' অর্থাৎ (আর নয়) ত কখনও ভাবা যায় না।

৬৭. এই বিষয়ে একনাথের মীমাংসা

কিন্তু তাতেও দুর্গতি হতে নিষ্কৃতি নাই। ধরুন, কোন লোক বাহ্য পরিস্থিতিকে নিজ কামনার অনুকূল করে নিয়েছে, অথবা ঠেকে গিয়েই কামনাকে সে পরিস্থিতির অনুকূল করে নিয়েছে, সে স্থলে ক্রোধের অবকাশ কোথায় থাকছে? কামনার ও পরিস্থিতির এরূপ সংগতি করে নিলে কামনা প্রতিহত হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল, তার মানে কাম থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এই বাক্যে আপত্তি উপস্থিত হল। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ একনাথ ভাগবতে আর এক যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, "কাম হয় অপূর্ণই থাকবে, কিংবা পূর্ণই হবে। অপূর্ণ থাকে ত তা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হবে; পূর্ণ হয় ত তা লোভের জন্ম দেবে।" তার মানে ক্রোধ শব্দের অর্থ "ক্রোধ ও লোভ এরূপ ব্যাপক করতে হবে।"

তার পরেকার সম্মোহ, সে হয় ক্রোধ হতে হবে, নয়ত লোভ হতে। নরকের তিন দ্বারের কথা বলতে গিয়ে গীতা এই কাম ও ক্রোধের সঙ্গে তাদের দোসর লোভকেও জুড়ে দিয়েছে। কাম থেকে যে ক্রোধ ও লোভ উৎপন্ন হয় সে অভিজ্ঞতা ত আছেই।

৬৮. ক্রোধ বলতে এখানে 'ক্ষোভ' বুঝতে হবে

কিন্তু এই প্রশ্ন সমাধানের পথ বস্তুত আর এক। এখানে 'ক্রোধ' শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়েছে একথা বুঝে নেওয়া দরকার। বিষয়ের একান্ত চিন্তন থেকে সঙ্গ উৎপন্ন হয়। 'সঙ্গ' মানে বিষয়ের সাকার রূপ গ্রহণ। তার পরে তা কান্ত, কমনীয় মনে হয় আর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে! এ হচ্ছে কাম। বলা হয়েছে যে এ থেকে ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। কখন কখন উৎপন্ন হয় তা বলা হয়নি। অতএব ক্রোধ শব্দ এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহার হয় নাই। ক্রোধের প্রচলিত স্থূল অর্থ হচ্ছে সন্তাপ, রাগ। এখানে সে অর্থ নয়। অর্থ হচ্ছে চিত্তের চলন অথবা ক্ষোভ। তুলনামূলক ভাষা-শাস্ত্র অনুসারে 'ক্রুধ্' ধাতুর মূল অর্থ ক্ষোভ, ব্যাকুলতা। এর সমানার্থক 'কুপ্' ধাতুর ব্যবহার ক্ষোভ অর্থে সংস্কৃতে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। কাম উৎপন্ন হলেই মনের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়। মনে অসন্তোষ জন্মে। পূর্ণ হোক বা না-ই হোক, কাম উৎপন্ন হলে চিত্তের সমতা নষ্ট হয়।

৬৯. ক্রোধ মানে ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের অপ্রসন্নতা

উল্টো দিকের পরম্পরা যা অন্বয়পদ্ধতি অনুসারে পরে বলা হয়েছে তা থেকেও এই অর্থই পাওয়া যায়। যে ইন্দ্রিয় জয় করে সে প্রসন্নতা লাভ করে, পরে একথা বলা হয়েছে। তা থেকে দেখা যায় যে ক্রোধ

শব্দ প্রসন্নতার বিরোধী বলে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আমার অমুক পদার্থ চাই মনের এরূপ ব্যাকুলতাকে কাম বলে। তা-ই অপ্রসন্নতা। সে বিষয় না পেলে আমি পূর্ণ নই, তাছাড়া আমি উনো—কামনার মূলে এরূপ রিক্ত-ভাবনা থাকে। তার ফলে কামনা থেকে মন মলিন হয়। নির্মলতা নাশ হয়। সংস্কৃতে প্রসন্ন শব্দ নির্মল অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বচ্ছ জলকে 'প্রসন্নং জলম্' বলা হয়—যথা সিংহগড়ের দেব-ট্যাঙ্কের জল। জলে একটি নুড়ি ফেলে ত তলদেশে যাওয়া পর্যন্ত তার সমস্তটা গতি একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রসন্নতা বলতে নির্মলতা ও স্বচ্ছতা বোঝায়। যে ঘাটে বাল্মীকি স্নান করতে গিয়েছিলেন তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "অকর্দমং ইদং তীর্থং সজ্জনানাং মনো যথা।" সজ্জনদের মন সবদিক থেকে মুক্ত, নির্মল ও স্বচ্ছ। "কোনকোপরা নেণে চিতে" জ্ঞানদেবের এই উক্তি সদৃশ তারা অকর্দম। কর্দম মানে ক্লেদ। ক্লেদ মানে জলের বাইরেকার বস্তু। তার রং জলে মেশে ত জল ময়লা হয়। আসলে জলের কোন রং নাই, তাই তা প্রসন্ন। আত্মা নিজের মূল স্বরূপে থাকে ত প্রসন্ন থাকে। তার বাইরের বস্তু পাবার ইচ্ছা হয় ত, তার রং তাতে ধরে ত, সেটা হচ্ছে তার মলিনতা। ওরই নাম অপ্রসন্নতা। বাহ্য কামনা এল ত হল ভেজাল। তখন কামনার প্রভাব আত্মার উপর পড়তে থাকে। তার পরে কামনার সামনে সে নিজে গৌণ হয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে যায়। তার মনে অস্থিরতা দেখা দেয়, অশান্তি ও ব্যাকুলতা আসে, ক্ষোভ জন্মে। একেই এখানে ক্রোধ বলা হয়েছে। কামনার কারণে চিত্তে যে স্পন্দন হয়, তাই এখানে ক্রোধ শব্দ দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। আত্মার মূল স্বরূপ রাত্রির নীরব, নিরভ্র, তারকাখচিত আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও নিস্পন্দ। অনন্ত শুভ গুণ যেন এই জগতের অনন্ত তারকা।

৭০. কামনা হেতু চিত্তে ক্ষোভ জন্মে কেন

আত্মা পরিপূর্ণ ও অনন্ত গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাহ্য বস্তুর জন্য মানুষ ব্যাকুল হয় কেন? বাইরের ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের ঝঞ্ঝাটে সে পড়তে যায় কেন? তার কারণ, মানুষের চিত্তের আত্মার দর্শন হয় নাই। আছে কেবল বহির্দর্শন। বাইরের সৃষ্টির সৌন্দর্য তাকে ভোলায়। অসৌন্দর্য করে ত্রাসের সৃষ্টি। বস্তুত সৌন্দর্য বা অসৌন্দর্য বাহ্য বস্তুতে নয়। সেখানে আছে মাত্র আকার। তদ্‌বিষয়ক অনুকূল ও প্রতিকূল বৃত্তি মুখ্যত চিত্তের কৃতি (সৃষ্টি)। চিত্ত ইন্দ্রিয়ের অধীন। গাধার ডাক আমাদের কানে বিশ্রী লাগে তাই চিত্তের কাছে তা বিশ্রী লাগে। বাস্তবিকপক্ষে তা কোমলও নয়, কর্কশও নয়; যেমনটি তেমনটিই। আমার কানে বিশ্রী লাগলেও গাধার কানে তা সুখদায়ী। ধরুন, সঙ্গীতে আমার রুচি। এই আওয়াজ মধুর আর ঐ আওয়াজ কর্কশ এরূপ যখন বিচার করি, তখন বাস্তবিকপক্ষে আওয়াজের উপর নিজ ভাবনা আরোপ করি না কি? আওয়াজ মিথ্যা একথা আমি বলছি না। তা বলি ত মার্কসবাদীরা পাল্টা জবাবে বলবে, 'এই সারা সৃষ্টিকেই আপনি কল্পনা বলবেন ত!' জগৎ সত্যই। তা আমার কল্পনার সৃষ্টি নয়। তাই ত বলি তা ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু ঐ বিষয়ের কল্পনা মাত্র আমার অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়াধীন চিত্তের। এরূপে সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে আমি অনুকূল ও প্রতিকূল বৃত্তি বানিয়ে নিই। ক্ষোভের এটাই হেতু। আত্মা পরিপূর্ণ এই ভাব জন্মালে চিত্ত সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন থাকে। কোনই অভাব-বোধ তার থাকে না। সে বলবে বাহ্য বস্তুর পিছনে ছুটে, তার জন্য ব্যাকুল হয়ে আমি পরবশ হতে যাই কেন? সেই বস্তু কেন আমার পিছনে ছুটবে না? তার জন্য আকুল-ব্যাকুল হয়ে নিজের চিত্তকে কেন

ডোবাব ? সে গোঁ করে বসে থাকে ত, আমি গোঁ ধরে থাকতে পারি না! বাহ্ বস্তুর অভিলাষ করতে থাকলে আত্মার ন্যূনতা ঘটে। আর তার ফলে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। চিত্তের এই ক্ষুব্ধতাকে এখানে ক্রোধ বলা হয়েছে।

দুই

৭১. ক্রোধ হতে মোহ হয় মানে বুদ্ধি ভোঁতা হয়

ক্রোধ থেকে মনে মূঢ়তা আসে—"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ"। বাল্য-কালে আমি বলতাম, 'রেগে টং হলেও আমার বুদ্ধি ঘটে থাকে।' ক্রোধে বুদ্ধির সমতা নষ্ট হয় এই জ্ঞানের অভাবই হচ্ছে বুদ্ধি ঠিক না থাকার লক্ষণ। মোহ মানে বুদ্ধির সকল শক্তি নাশ হয়ে যাওয়া এরূপ অর্থ করা উচিত হবে না ঃ বুদ্ধির প্রখরতা লোপ পেয়ে তা ভোঁতা হয়ে যায় অর্থাৎ মূঢ়তা আসে—এরূপ বুঝতে হবে। এই অবস্থায় কর্তব্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে মানুষ গোলযোগে পড়ে। এর নাম সম্মোহ।

৭২. মোহ থেকে স্মৃতি-ভ্রংশ হয় অর্থাৎ আমি যে কে সে বোধই থাকে না

এভাবে সম্মোহ আসে ত স্মৃতি-ভ্রংশ হয়। স্মৃতি-ভ্রংশ মানে সাধারণ বিস্মৃতি নয়। আমি যে কে সেকথা ভুলে যাওয়া হচ্ছে স্মৃতি-ভ্রংশ। অনেক কিছু মনে থাকাই স্মৃতি নয়। আমি যা যা বলছি কেউ যদি ঠিক ঠিক তা বলে যায় ত তাকে আমি জড়-যন্ত্র বলব। বলব, কি ভুলে যেতে হয় আর কি মনে রাখতে হয় সেই বিচার-শক্তি তার নাই। বাছ-বিচার স্মৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। সব কিছু মনে রেখে তার বোঝা বইতে যাব

কেন ? বিচার করে কিছু ছাড়তে হবে কিছু রাখতে হবে। উচিত স্মরণ ও উচিত বিস্মরণ মিলে সম্যক স্মরণ-শক্তি। তাই এখানে স্মৃতি মানে আমি কে একথার নিরন্তর স্মরণ, আত্মার নিরন্তর স্মরণ।

৭৩. বোধ থাকে না—একথার অর্থ

আত্মার কথা মানুষের সতত ভুল হয়। খেলার মাঠে গিয়ে বলে আমি খেলোয়াড়। যুদ্ধক্ষেত্রে বলে আমি যোদ্ধা। পুত্রকে দেখে ত বলে আমি পিতা। আমি পবিত্র, রঙ-রহিত, উপাধি-বর্জিত পরিশুদ্ধ আত্মা একথা সে একেবারে ভুলে যায়। যখন যে পরিস্থিতিতে পড়ে সেই রং সে ধরে। এর নাম স্মৃতি-ভ্রংশ। সাধারণ ব্যবহারেও একে আমরা স্মৃতি-ভ্রংশের লক্ষণ বলে মনে করি। কোন লোক নিজ জ্ঞান হারিয়ে যদি আবোল-তাবোল বকে ত আমরা বলি, 'লোকটার মাথা ঠিক নেই। বুদ্ধিভ্রম হয়েছে।' একেই বলে স্মৃতি-ভ্রংশ। নদীরা যতই কূল-ভাসিয়ে, উথাল-পাথাল করে সমুদ্রে গিয়ে পড়ুক না কেন, সমুদ্র তবু শান্তই থাকে। নদী শুকিয়ে গেলেও তার আয়তন কমে না। নিজের গাম্ভীর্য ও শক্তি বিস্মৃত হয়ে সে যদি নদীর পিছনে ধাবিত হত ত আমরা কি বলতাম ? একথাই বলতাম না কি যে সমুদ্র নিজেকে ভুলে গেছে ? আমাদের সম্বন্ধেও সেই কথা। সারা সৃষ্টির আমি সাক্ষী। দৌড়াতে চায় ত তারা আমার পিছনে দৌড়াক। আমি তাদের পিছনে দৌড়াতে যাব না ! আমি পরিপূর্ণ, কমতির লেশও আমাতে নাই—এই জ্ঞানের নাম স্মৃতি। পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অপূর্ণতার বোধ হওয়া—এ হচ্ছে স্মৃতি-ভ্রংশ। কোন রাজা যদি স্বপ্নে দেখে যে সে ভিক্ষা করছে তবে তার সম্বন্ধে যেমন বলা হবে যে সে রাজভাব ভুলে গেছে, এই দশাও ঠিক তেমনি।

৭৪. স্মৃতি-ভ্রংশ হতে বুদ্ধি-নাশ

এভাবে মানুষ যখন নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন তার বুদ্ধি নষ্ট হয় অর্থাৎ তা বিষয়ের অধীন হয়ে যায়। বুদ্ধি বিষয়াধীন কিংবা বিষয়নিষ্ঠ হলে সে তার নিজের মূল-স্থিতি খুইয়ে বসে। বুদ্ধির মূল-স্থিতি নষ্ট হওয়াকেই বুদ্ধি-নাশ বলে। মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে যায় ত তার বুদ্ধি নিজের মূল-স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়—'স্মৃতি-ভ্রংশাৎ বুদ্ধি-নাশঃ'। বুদ্ধি মানে জ্ঞান-শক্তি। আত্মাকে জানার সামর্থ্য এক বুদ্ধিরই আছে। সেই বুদ্ধি সামান্য বিষয়-রসের ব্যাপারে ব্যবহার করার অর্থ তার অধিকার কেড়ে নেওয়া। মা ছেলের আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দিলেন। ময়রার দোকানে গিয়ে দুইটি সন্দেশের বদলে সে তা বেচে এল। এও তেমনি। বুদ্ধি সর্বকান্তিময় (পূর্ণসুন্দর), সর্বপ্রভাবতী (পূর্ণ তেজোময়ী) শক্তি। বিচারের মত প্রভা, বিচারের মত তেজ অন্য কিছুতে নাই। এরূপ বিচার-সমর্থ বুদ্ধিকে এই বিষয়ে খরচ করা মানে তাকে নাশই করা। আত্মার জ্ঞান লাভ করা বুদ্ধির বিশেষ সামর্থ্য। বুদ্ধি বিষয়-নিষ্ঠ হলে সেই সামর্থ্য সে খুইয়ে ফেলে। এ তার নাশ নয়ত কি? আত্ম-নিষ্ঠাহারা বুদ্ধি যতই প্রখর মনে হোক, সে তার নিজের নাশ করে বসেছে, একথা বুঝতে হবে।

অষ্টম ব্যাখ্যান

এক

৭৫. পূর্ব আলোচনার সারঃ বুদ্ধি-নাশই বিনাশের শেষ ধাপ

ন-কার দিয়ে ও হাঁ-কার দিয়ে, 'ব্যতিরেকমুখে ও অন্বয়মুখে' ইন্দ্রিয়-নিরোধের সহিত প্রজ্ঞার সম্বন্ধ দেখাচ্ছিলাম। বিষয়-চিন্তন হতে বুদ্ধি-নাশ পর্যন্তের পরম্পরা ব্যতিরেক দ্বারা দেখিয়েছি। বুদ্ধি-নাশ এই পরম্পরার অন্তিম ধাপ। অন্য দিকে, বুদ্ধির স্থিরতা যে অপর অন্তিম ধাপ তা অন্বয়-পরম্পরাক্রমে দেখতে হবে। ওদিকে অন্তিম ধাপ হচ্ছে বুদ্ধির স্থিরতাঃ এ দিকে হচ্ছে বুদ্ধি-নাশ। 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' পরে এরূপ বলা হয়েছে। বুদ্ধি-নাশের পরে আরও কোন ধাপ আছে একথা বলার জন্য তা বলা হয়নি। ঐ বাক্য দ্বারা বুদ্ধি-নাশের ভয়ানক পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বুদ্ধি গেল কি সব গেল। আত্মনাশই তাকে বলতে হবে। নাশ হওয়ার আর কিছু বাকী থাকছে না, এ হচ্ছে তার অর্থ। পরে একথা স্পষ্ট হবে।

৭৬. সূক্ষ্ম অর্থই গীতার অভিপ্রেত অর্থ

এ শ্লোকের সকল পদের সূক্ষ্ম অর্থ আমরা করেছি। তেমন সূক্ষ্ম অর্থ না করে কেবল স্থূল অর্থ করলে অল্পেতেই মানুষের সমাধান হবে। অল্পেতেই লোকে নিজেদের স্থিতপ্রজ্ঞ মনে করতে থাকবে। স্থূল অর্থ

নয়, সূক্ষ্ম অর্থই যে গীতার অভিপ্রেত তা উপনিষদের সমানার্থক একটি বাক্য থেকে বোঝা যায়। এই সেই বচন—"আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব-গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" এর অর্থ—"আহার-শুদ্ধি থেকে চিত্ত-শুদ্ধি আসে। তা থেকে অবিচল স্মৃতি লাভ হয়। স্মৃতি লাভ হলে মানুষ চিত্তের সকল গ্রন্থি থেকে মুক্তি লাভ করে।" এখানে আহার শব্দের অর্থ সেরেফ অন্ন ধরলে হবে না, অধিকন্তু তার সঙ্গে সর্ব ইন্দ্রিয়ের আহারও ধরতে হবে। গীতায় উক্ত 'নিরাহার' শব্দের অর্থও আমি এরূপই করেছি তা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। আগে আমরা ভক্তিমার্গের 'বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া' বলে যা দেখেছি তাও এই। অশুদ্ধ আহার বর্জন করে ইন্দ্রিয়সমূহকে শুদ্ধ আহার দিতে থাকলে চিত্তের বা বুদ্ধির শুদ্ধি ঘটে। তা হলে 'ধ্রুবা স্মৃতি' লাভ হয়, নিজ জ্ঞান অটল থাকে। আর পরে চিত্তের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। নানা বিচার-সংস্কারের গ্রন্থি বা গাঁট মানুষের মনে থাকে। এই গ্রন্থিসমূহকে ইংরেজিতে 'কম্‌প্লেক্‌স্' বলে। বুদ্ধি শুদ্ধ হওয়া মানে এই সব গ্রন্থি দূর হয়ে যাওয়া। এই সব গাঁট দূর হয়ে গেছে কি বুদ্ধি মুক্ত হয়েছে। তখন বুদ্ধি আয়নার মত স্বচ্ছ হয়। আর পরে আত্মার প্রতিবিম্ব তাতে প্রতিফলিত হয়।

৭৭. স্মৃতি বনাম স্মরণ-শক্তি

স্মৃতি-লাভ থেকে এখানে এত সব কার্য প্রত্যাশা করা হয়, তাই 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ সাধারণ স্মরণ-শক্তি করা যাবে না। সাধারণ স্মৃতি-শক্তি বলতে ইংরেজিতে যাকে 'মেমরি' বলে, এবং তর্কশক্তির ন্যায় যার বিকাশের প্রযত্ন স্কুলে করা হয়, তা বোঝায়। ব্যবহারিক জগতে ভোলা-মন হলে চলে না। স্মৃতি-ধর হওয়া চাই। তমোগুণে আচ্ছন্ন লোক মন-ভোলা হয়ে যায়। ফলে তার ব্যবহার-কুশলতা লোপ পায়। তমোগুণ এত

বেশী না হলে ব্যবহারোপযোগী স্মরণ-শক্তি তার রক্ষা পেতে পারে। এইটুকুই মাত্র সাধারণ স্মরণ-শক্তির কার্য। কিন্তু হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন করার প্রত্যাশা এই স্মরণ-শক্তি থেকে যেন কেউ না করেন। নানা উপনিষদে ও গীতায় যে স্মৃতির উল্লেখ আছে তা শক্তি নয়, তা এক অবস্থা। আত্মার নিত্য-স্মরণ—এ হচ্ছে তার স্বরূপ। আত্মার নিত্য-স্মরণ থাকলে অন্য সব সংস্কার চিত্তের ওপর যত প্রচণ্ড আক্রমণই করুক, তার প্রভাব চিত্তের ওপর পড়ে না। ঐ সব সংস্কারের আক্রমণ ঠেকাতে পারে এমন আত্মস্মৃতির ঢাল হাতে নিয়ে যে বুদ্ধি সতত প্রস্তুত, তার আত্মদর্শন সুনিশ্চিত।

৭৮. আত্ম-স্মৃতির অভাব হলে সংস্কার-পরাধীনতা আসে

এর উল্টো, যেখানে আত্ম-বিস্মৃতি সেখানে চিত্তের ওপর বাইরের সংস্কারের নানা দাগ লাগতে থাকে। শিশুদের মনে যে কোন সংস্কারের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে। আমরা বলি ছোটদের মন স্বচ্ছ, কোমল। যে কোন সংস্কার ঝট্ করে নিয়ে নেয়। কিন্তু শিশুদের সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতিই এর কারণ। তার ফলে বাইরের যে কোন আঁচড় তাদের চিত্তে রেখা পাত করে। আর তাকে আমরা বলি চিত্তের সংস্কার-প্রবণতা, সংস্কার-সুলভতা। কিন্তু, সংস্কার ভাল হলে তারা ভাল হবে। খারাপ হয় ত হবে খারাপ। যেমন সংস্কার তেমন তার ছাপ। এই দৃষ্টিতে সংস্কার-সুলভতাকে চিত্তের ভয়ানক দশা বলতে হবে। জ্ঞানী মানুষের মন শিশুর মত, একথা বলার অর্থ এই নয় যে তা সংস্কার-সুলভ। তা শিশুর মনের মত অকৃত্রিম, দম্ভরহিত, মুক্ত, সহজ —এই তার অর্থ। মনে আত্ম-স্মৃতির নিরন্তর জাগ্রত পাহারা মোতায়েন

থাকে ত অন্য সংস্কারের ভয় তার থাকে না। এরূপ মানুষ যদি ভরা হাটে গিয়েও বসে তবুও আত্মস্থ থাকে। কোনই ভয় তার নেই। রক্ষণের পরপারে সে পৌঁছে গেছে। আত্ম-স্মৃতি সদা জাগ্রত বলে রক্ষাকবচের বা বেড়ার কোন দরকার নাই। নীতিশাস্ত্রের নিয়মের বেড়া সাধারণ চিত্তের সংরক্ষণার্থ দরকার। এখানে সেই স্থিতি নয়। আত্ম-বিস্মৃতি ঘটলে বুদ্ধি বাহ্য আক্রমণের শিকার হয়। সেই জন্য বাইরের কৃত্রিম সংরক্ষণের আবশ্যকতা সে বোধ করে। কিন্তু আত্ম-স্মৃতির অভাবে সেই সব সংরক্ষণই অকেজো সাব্যস্ত হতে পারে।

৭৯. গীতা-শ্রবণের ফলিত মোহনাশ আর তজ্জন্য স্মৃতি-লাভ

স্মৃতি শব্দের অর্থ এখানে আত্মস্মৃতি করা সঙ্গত হবে। এর আর একটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। এখানে সম্মোহ থেকে স্মৃতি-ভ্রংশ আর স্মৃতি-ভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এই পরম্পরা দেখানো হয়েছে। এখন এর বিপরীত পরম্পরা ঠিক ক্রমানুসারে সাজালে যে ক্রম দাঁড়ায় তা হতে এই শব্দের অর্থ স্পষ্ট হবে। সেই উল্টো ক্রম এই: মোহ-নাশ হতে স্মৃতিলাভ আর স্মৃতি-লাভ থেকে বুদ্ধির সন্দেহ ঘুচে গিয়ে বুদ্ধির স্থিরতা-লাভ। গীতা-শ্রবণের পরে অর্জুন তাঁর মনের সেই সময়কার অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে ঠিক এই শব্দেই পরম্পরা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলছেন, "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্ লব্ধা······স্থিতোঽস্মি গত-সন্দেহঃ" —'গীতা-শ্রবণের ফলে আমার মোহ দূর হয়েছে, আমার স্মৃতি লাভ হয়েছে, আমার সকল সন্দেহ ঘুচে গেছে।' অর্জুনের কি প্রকারের মোহ হয়েছিল তা লক্ষ্য করলে মোহ শব্দের ও তৎসঙ্গে স্মৃতি-শব্দের অর্থ বোঝা যাবে।

৮০. মোহনাশ মানে কর্তব্য সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয়তা

দেখা যায় যে অর্জুনের কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে মোহ উপস্থিত হয়েছিল। অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মোহ শব্দের অর্থ এখানে কর্তব্য-মোহ করতে হবে। কি কারণে অর্জুনের এই মোহ হয়েছিল? যুদ্ধে আমার এই সব আপন জনদের মারতে হবে এই ভেবে তার মন একান্ত ব্যাকুল হয়েছিল। তার চিত্তের ব্যবস্থিতি, বিন্যাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মনে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এরা আমার, ওরা পর এই ভাবনা থেকে তার মন ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দুর্বল-হৃদয় বিচারকের সামনে তার পুত্রকে আসামী হিসাবে হাজির করলে তার মনে হতে থাকে যে আমার ছেলে বেঁচে যায় ত ভাল হয়। কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে মনে সংশয় জন্মে। তার মন দোল খেতে থাকে। সে বহুধা হতে থাকে। কি করবে স্থির করে উঠতে পারে না। অর্জুনের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল। গীতার প্রারম্ভে অর্জুন নিজের সম্বন্ধে এরূপ বলেছিল, "পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম-সংমূঢ়চেতাঃ"—'আমার বুদ্ধি সংমোহে গ্রাস করেছে। কি করব স্থির করতে পারছি না। তাই আপনার শরণ নিচ্ছি।' অর্থাৎ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে অর্জুনের মোহ উপস্থিত হয়েছিল। গীতার মূল ভূমিকা এরূপ বলে মূল ভূমিকায় মোহ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের প্রকরণে তার সেই অর্থ করাই সঙ্গত হবে, একথা সুস্পষ্ট।

৮১. এই অনুষঙ্গে ক্রোধ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিচার

অর্জুনের মোহ কিভাবে হয়েছিল সেই বিচার করলে ক্রোধ শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তা দেখে নেওয়া ভাল হবে। অর্জুনের

মোহ উপস্থিত হয়েছিল ত বটেই কিন্তু স্থূল অর্থে তার ক্রোধ জন্মে নাই। কিছুমাত্র রাগ বা সন্তাপ তার হয় নাই। এরা আমার আত্মীয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এরা এখানে এসেছে একথা ভেবে তার বিষাদ উপস্থিত হয় আর তা থেকেই তার কর্তব্য-মোহ জন্মে। কিন্তু গীতা বলে, ক্রোধ হতে মোহ জন্মে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, গীতার দৃষ্টিতে বিষাদ ও ক্রোধ পর্যাযবাচী শব্দ। এই বিষাদ শব্দটি বিচার করে দেখার মত। প্রসন্নতা-সূচক তিন-অক্ষরী 'প্র-সা-দ' শব্দ হতে তিন-অক্ষরী 'বি-ষা-দ' শব্দের অর্থ একেবারে উল্টো। আর ক্রোধের স্বরূপ যে এমনিই প্রসন্নতা-বিরোধী তা আমরা আগে দেখেছি। এই অর্থে ক্রোধ ও বিষাদ দুইই ক্ষোভ-সূচক হয়ে যায়।

৮২. 'স্থিতোঽস্মি গত-সন্দেহঃ' মানে আমি স্থিত-প্রজ্ঞ হয়েছি

এরূপ ক্ষোভ থেকে অর্জুনের কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ক মোহ জন্মে আর ভগবানের কৃপায় গীতা-শ্রবণের ভাগ্য লাভ করে সেই মোহ দূর হয়ে গেছে, অর্জুন এরূপ বলছে। তারপর মোহ দূর হওয়ায় আমার স্মৃতি লাভ হয়েছে ও আমার সকল সন্দেহ গিয়েছে, ঠিক এরূপ উপনিষদের ভাষায় সে আশ্বাস দিচ্ছে। এ থেকে স্মৃতি-শব্দের অর্থের উপর স্বচ্ছ আলোকসম্পাত হচ্ছে। আমার সর্ব সন্দেহ ছিন্ন হয়েছে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে নানাবিধ যে গ্রন্থি ছিল তা দূর হয়েছে, বুদ্ধি স্থির হয়েছে, আমি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছি, এরূপই তার অর্থ করতে হবে। ঐতিহাসিক অর্জুনের প্যাঁচে পড়ে এই বাক্যের গৌণ অর্থ করা ঠিক হবে না। ব্যক্তিবিশেষের কথা না ভেবে শব্দের যথাশ্রুত সূক্ষ্ম অর্থ করা আমাদের উচিত হবে। একেবারে মূলে প্রবেশ করে শব্দের সূক্ষ্ম, অন্তিম ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অর্থ গ্রহণে মানব-বুদ্ধি সক্ষম—এটা তার সহজ গুণ। আর তাতেই

মানবের শ্রেয়। অর্জুনের বাক্যের এই যে 'স্থিতোঽস্মি' শব্দ তার সূচক : স্থিত শব্দ হতে স্থিতপ্রজ্ঞ মনে আসা চাই।

দুই

৮৩. নারদের পন্থানুসরণে নিজ নিজ ভূমিকা অনুযায়ী স্থূল অর্থও গ্রহণ করা যায়

কিন্তু শব্দের এরূপ সূক্ষ্ম অর্থমাত্র করলে এই শ্লোক সাধারণ মানুষের কাজে তেমনটা আসবে না। নিজের প্রয়োজনমত সীমিত অর্থ করিত পূর্বের কথনমত অল্পেই তুষ্ট হয়ে যাব আর প্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। অতএব প্রয়োজনমত দুই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। নারদ ভক্তিসূত্রে এই সব শব্দের স্থূল অর্থ করেছেন। তাঁর সূত্র এই : "দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ। কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশ-কারণত্বাৎ। তরঙ্গায়িতা অপীমে সংগাৎ সমুদ্রায়ন্তি।" এর অর্থ এই—'কুসঙ্গ সর্বভাবে ত্যাগ করা চাই। কারণ তা থেকে কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতি-ভ্রংশ এই পরম্পরাক্রমে বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশ হয়ে থাকে। মানুষের মনে এই সকল বিকার মূলত বুদবুদের মত অল্প বটে; কিন্তু কুসঙ্গের দরুন সমুদ্রের মত বিশাল হয়ে যায়।' নারদের এই সূত্রানুযায়ী এই শ্লোকগুলির অর্থ নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে করতে হবে কিন্তু দেখতে হবে সে অর্থ যেন যথাসম্ভব প্রগতিশীল হয়।

৮৪. বুদ্ধিনাশ-পরম্পরার বিভাজন রহস্য : আক্রমণ প্রথমে মনের উপর, পরে বুদ্ধির উপর

এই দুই শ্লোকের আরও একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। প্রথম শ্লোক আরম্ভ হয়েছে "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" দিয়ে আর শেষ হয়েছে "কামাৎ

ক্রোধোঽভিজায়তে" দিয়ে। পরের শ্লোকে "ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ" থেকে বুদ্ধিনাশ পর্যন্ত অংশের বিবেচনা রয়েছে। এরূপ বিভাগ কেন করা হল ? এর কোন উদ্দেশ্য নাই কি ? মানুষের চিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত— মন ও বুদ্ধি। বিষয়চিন্তনের ফলে মনের ওপর কিভাবে আক্রমণ চলে তা প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে। বুদ্ধির ওপর তার প্রহারের স্বরূপ কি তার বিবেচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্লোকে। বিষয়ের প্রহার প্রথমে মনের উপর হয়। সিধা বুদ্ধির ওপর হয় না। তাই মন বিকার-যুক্ত হলেও বুদ্ধি ঠিক আছে এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা বেশী সময় স্থায়ী হয় না। তাই সময়ে সাবধান হয়ে মনের উপর আক্রমণ আরম্ভ হতেই তা মূলে নাশ করতে হয়। এভাবে দেখেন ত, প্রথম আক্রমণ ইন্দ্রিয়েরই উপর হয়। বিষয়ের তা প্রথম কেল্লা। সেখানেই তাদের আক্রমণ ঠেকানো চাই। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে এর বিশেষ বিবেচনা রয়েছে। "ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ অস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে"—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এরা কামনার আশ্রয়রূপ তিন কেল্লা। ইন্দ্রিয় সবের বাইরেকার। তাই যুদ্ধের আরম্ভ করতে হবে ইন্দ্রিয় হতে। পূর্বেই তা আমরা দেখেছি।

নবম ব্যাখ্যান

এক

৮৫. স্থির-বুদ্ধির পরম্পরার আরম্ভ : রাগ-দ্বেষ-মুক্ত ইন্দ্রিয়-ব্যবহারকারী প্রসাদ লাভ করে

বিষয়-চিন্তন থেকে বুদ্ধি-নাশ পর্যন্ত পরম্পরার আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন পরের দুই শ্লোকে বিপরীত পরম্পরা দেখানো হচ্ছে। বুদ্ধি-নাশের পরম্পরা থেকে এই শিক্ষা আমরা পাই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় অর্থেই ইন্দ্রিয় জয় করা চাই। তবেই বুদ্ধি রক্ষা পাবে। এখানে প্রশ্ন উঠবে, তা হলে আত্মজ্ঞানী পুরুষ কি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারই বন্ধ করে দেবে ? এই প্রশ্নের উত্তর নীচে দেওয়া যাচ্ছে।

রাগ-দ্বেষ-বিযুক্তৈস্ তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্ম-বশ্যৈর্ বিধেয়াত্মা প্রসাদং অধিগচ্ছতি ॥

অর্থ : বিষয়ের সম্বন্ধে বৈরাগ্য স্থির হলে ইন্দ্রিয়সমূহ বশে আসে। এরূপ স্ব-অধীন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়-সেবনকারী পুরুষ প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা লাভ করে। এর তাৎপর্য এই যে জ্ঞানী পুরুষই কেবল নির্ভয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার করতে পারে। ইন্দ্রিয়ের ওপর যার কর্তৃত্ব নাই তার ভয় আছে। যার ভয় আছে নির্ভয়ের মত তার মোটেই চলা উচিত নয়। ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার থেকে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সেই বিপদের শঙ্কা যার নাই সে ইন্দ্রিয়ের সব রকম উচিত ব্যবহার করতে পারে। বস্তুত তার দৃষ্টিতে সর্ব ব্যবহার আধ্যাত্মিকই হবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে

আহার দিতে গিয়ে যেন রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন না হয়—বস্, তা হলেই হল। প্রসন্নতালাভের জন্য ইন্দ্রিয়ের জয় আবশ্যক। এর অর্থ এই নয় যে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারই করা হবে না। ইন্দ্রিয় হতে যদি কোন কাজই না নেওয়া হয় তবে ইন্দ্রিয়-জয়ের দরকারই থাকে না। আসল কথা, ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ো না। ছুরির ব্যবহার করা আর ছুরির অধীন হওয়া এই দুইয়ে তফাত আছে। ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটা ছুরির ব্যবহার করা। আঙুলের ওপর চালিয়ে দিয়ে হাত কাটা মানে ছুরির অধীন হওয়া। ভগবানের সেবার জন্যে ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার করার অর্থ ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটা। কিন্তু তাদের বশ হয়ে বুদ্ধি-নাশ করে বসার অর্থ ছুরি দিযে আঙুল কেটে ফেলার মত।

৮৬. দুই পরম্পরার মুখ্য মুখ্য ধাপ : বীজ, শক্তি, ফলিত

বুদ্ধি-নাশের পরম্পরা যেরূপ স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে, তার উল্টো পরম্পরা তদ্রূপ সবিস্তারে এখানে দেখানো হয় নি। একটি পরম্পরা উত্তমরূপে দেখালে পর তা থেকে অপরটি স্পষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া পরম্পরার সকল ধাপের গুরুত্ব সমান নয়। আদি, মধ্য, অন্ত অথবা শাস্ত্রীয় ভাষায় বললে, বীজ, শক্তি, ফলিত—এই তিন ধাপ লক্ষ্যে রাখলেই হল। বিষয়-চিন্তন বীজ। তা থেকে অপ্রসন্নতা বা চিত্ত-চাঞ্চল্য (ক্রোধ শব্দ বাদই দিচ্ছি)—এটা শক্তি। আর বুদ্ধি-নাশ—ফলিত। এর বিপরীত দিকে, বিষয় হতে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হতে না দেওয়া হচ্ছে বীজ। প্রসন্নতা—শক্তি। আর বুদ্ধির স্থিরতা—ফলিত। প্রধান তিন ধাপের কথা বলা হল। তা থেকে পরিপূর্ণ পরম্পরা খাড়া করা যেতে পারে।

৮৭. প্রসাদ শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভুল ধারণা

প্রসাদ শব্দের অর্থের বহু আলোচনা হয়েছে। তা হলেও ঐ শব্দ মোটের উপর ভুল ধারণা সৃষ্টি করে। তার অর্থ যদি প্রসন্নতা করেন, তবুও ভুল ধারণা পুরোপুরি দূর হয় না। প্রসন্নতার অর্থ আজকাল উল্লাস বা আনন্দ করা হয়। কিন্তু বস্তুত প্রসাদ কিংবা প্রসন্নতা মানে উল্লসিত বৃত্তি বা হর্ষ নয়। প্রসাদ মানে বিষাদ নয় আর হর্ষও নয়। কিন্তু লোকে তার অর্থ সাধারণত হর্ষ করে থাকে। রামচন্দ্রের মুখশ্রীর বর্ণনা করতে গিয়ে তুলসীদাসজী বলেছেন ঃ

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতঃ।
তথা ন মম্লে বনবাস-দুঃখতঃ॥
মুখাম্বুজ-শ্রী রঘু-নন্দনস্থ মে।
সদাস্তু সা মঞ্জুল-মঙ্গল-প্রদা॥

'রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে যাতে প্রসন্নতা দেখা যায় নাই। আর বনবাসের দুঃখ উপস্থিত হলেও যাতে বিষাদের ছায়াপাত হয় নাই, রামের সেই মুখকান্তি আমাদের নিত্য মঙ্গল করুক।' তুলসীদাসজী এখানে প্রসন্নতা শব্দ স্পষ্টত তখনকার লোক-প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আজ যদি তুলসীদাসজী বেঁচে থাকতেন তা হলে ভাষার শাস্ত্রীয়তার দিক থেকে তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করতাম যে 'প্রসন্নতাং যা ন গতা'— না বলে তিনি যেন 'প্রহৃষ্টতাং যা ন গতা' বলেন। রামের মুদ্রা হর্ষ-বিষাদ-রহিত ছিল এই না তিনি বলতে চেয়েছেন। তারই নাম প্রসন্নতা।

৮৮. বস্তুত প্রসাদ মানে প্রসন্নতা অর্থাৎ স্বাস্থ্য

প্রসন্নতার অর্থ নির্বিকারতা, শান্তি, গাম্ভীর্য। গাম্ভীর্য শব্দে ভয় লাগে ত দিন তা ছেড়ে। প্রসন্নতা শব্দ থেকে ভীতি লাগার কথা নয়। প্রসন্নতা মানে রাগ-দ্বেষ-রহিততা, স্বচ্ছতা, নির্মলতা। যার দর্শনমাত্রে দুঃখ শান্ত হয়, তা প্রসন্নতা ; এ হচ্ছে প্রসন্নতার লক্ষণ। কারো ছেলে মরেছে। তার চিত্ত একেবারে উদাস হয়ে গেছে। কোথাও তার ভাল লাগে না। কোন ঝরনার ধারে গিয়ে বসল। মন শান্ত হল। এটা ঝরনার নির্মলতার গুণ। নির্মলতা স্বয়ংপ্রচারক। স্বতই তার প্রভাব হয়। তার দর্শনমাত্রে আনন্দ জন্মে। প্রসন্নতার অর্থ ব্যক্ত করার পক্ষে ভাষ্যকারদের প্রযুক্ত 'স্বাস্থ্য' শব্দ উপযোগী হবে। 'স্বাস্থ্য' শব্দে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সুস্থতা দুইই বোঝায়। বৈদ্যশাস্ত্র-মতে শারীরিক স্বাস্থ্য বলতে শরীরে ধাতু-সাম্যতা থাকা বোঝায়। মানসিক স্বাস্থ্য বলতে চিত্তের সমত্ব থাকা, মানসিক শান্তি থাকা বোঝায়। এরূপে এই দুই অর্থের সংগ্রাহক এই স্বাস্থ্য শব্দকে প্রসন্নতার ঠিক অভিপ্রেত পর্যায় (সম-অর্থক শব্দ) বলা যাবে।

৮৯. প্রসন্নতার দরুন সকল দুঃখ বরাবরের মত দূর হয়ে যায়, কারণ দুঃখমাত্রই মনোমলের পরিণাম

'প্রসাদে সর্ব-দুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে'

ইন্দ্রিয়-জয় দ্বারা লব্ধ প্রসন্নতা হতে সকল দুঃখ একেবারে দূর হয়ে যায়। প্রসন্নতার এরূপ বৈশিষ্ট্য গীতা দেখিয়েছেন। অন্য সুখের সাধন দ্বারা কোন কোন দুঃখ দূর হয়, আর তখনকার মত। খেলে ক্ষুধা মেটে। খানিক বাদে আবার লাগে। ঘুমালে শ্রান্তি দূর হয়। আবার পরে

ঘুম থেকেই শ্রান্তি আসে। এরূপে বিভিন্ন দুঃখ দূর করার জন্য বিভিন্ন সুখের শরণ সতত নিতে হয়। কিন্তু প্রসন্নতা দিয়ে সকল দুঃখ ঝেড়ে ফেলা যায়। কারণ যেখান থেকে দুঃখের উদ্‌গম ঠিক সেখানেই প্রসন্নতা নিজ আসন পাতে। পরীক্ষান্তে বিজ্ঞান সপ্রমাণ করেছে যে দুঃখের সংবেদন মস্তিষ্ক পর্যন্ত না পৌঁছলে দুঃখের অনুভব হয় না। তদ্রূপ যার চিত্তে প্রসন্নতার ঝরনা বয়ে চলেছে দুঃখ তার মন টলাতে পারে না। অন্ধকার গুহায় বাতি নিয়ে গেলে সেখানকার অন্ধকার নাশ হয়ে যায় একথা বলা অপেক্ষা, আঁধারই আলোর রূপ ধরে এরূপ বলা সমধিক ঠিক হবে। ঠিক তদ্রূপ অন্তঃকরণ যে ক্ষেত্রে নির্মল অর্থাৎ প্রসন্ন সে স্থলে দুঃখই সুখরূপ হয়ে যায়। কারণ দুঃখমাত্রই মানুষের মনোমলের পরিণাম। তা সে দুঃখ শরীরেরই হোক বা মনের।

দুই

৯০. প্রসন্নতা থেকে সহজে স্থির-বুদ্ধি লাভ হয়

চিত্ত প্রসাদযুক্ত কিংবা প্রসন্ন হয়ে যায় ত বুদ্ধি দেখতে দেখতে স্থির হয়। "প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।" প্রসন্নতা এলে স্থিত-প্রজ্ঞা আসতে বিলম্ব হয় না। নির্বিকারতা কিংবা প্রসন্নতা চিত্তের স্থিরতার প্রত্যক্ষ সাধন। অন্য যে সবকে চিত্তের স্থিরতার সাধন বলে গণ্য করা হয়, তা দিয়ে কিছুকালের জন্য চিত্ত একাগ্র হয়। এই সকল সাধন কৃত্রিম ও তৎকালস্থায়ী। চিত্তের ময়লা ধুয়ে ফেললে স্থায়ী স্থিরতা আপনা হতেই লাভ হয়। স্থিরতা যখন চিত্তের সহজ অবস্থা হয়ে যায় ব্যাকুলতাই উল্টো তখন দুঃসাধ্য হয়।

৯১. যেমন বালকের

শিশুদের চিত্তের একাগ্রতার কারণ ঠিক এই। শিশুর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকান। পলক না ফেলে তারা একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে। সে সময়ের মধ্যে আমরা দশবার খুলি, দশবার বন্ধ করি। তাদের চোখের সামনে যোগীর মুদ্রা পর্যন্ত হার মানে। তাদের চিত্তের নির্মলতা হচ্ছে এর কারণ। কিন্তু নির্ভয়তা তাদের ততটা নাই। তাই ভয় এলে তারা চক্ষু বোজে। শিশুদের চিত্ত শিক্ষণ-শাস্ত্রের ব্যর্থ বাদানুবাদের বিষয় হয়ে গেছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেন যে শিশুদের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল। বাস্তবপক্ষে তাদের চিত্ত চঞ্চল নয়। চঞ্চল শিক্ষকদের। কিন্তু আরোপ করা হয় শিশুদের ওপর। একেই বলে, 'উল্টো, চোর শাসায় কোতোয়ালে'। শিশুর পক্ষে একাগ্রতা আদৌ কঠিন নয়। আমাদের এখানে চরখা কাটার সময়ে ছোটরা এতটা তন্ময় হয়ে যায় যে তা দেখে বড়দের মহা আশ্চর্য লাগে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? সতত বহতা ধারা একাগ্রতার সহায়ক। তাই ত শিবলিঙ্গের ওপর অভিষেকের ধারা বইয়ে একাগ্রতার অভ্যাস করা হয়। অখণ্ড বহমানা ঝরনার ধারে বসেছেন কি চিত্ত একাগ্র হয়ে যাবে। তদ্রূপ সুতার তার একটানা বেরুতে থাকলে ছোটদের নির্মল মন সহজে ধ্যানস্থ হয়ে যায়। ছোটদের মস্তিষ্কের শক্তি কম বলে তাদের ধ্যান অনেকক্ষণ থাকে না, সে কথা আলাদা। কিন্তু একথায় সন্দেহ নাই যে একাগ্রতা তাদের পক্ষে সহজ। কেমন সহজ? মুখে মিছরির টুকরো গুঁজে দেন ত সারা দুনিয়া ভুলে সেই স্বাদে মজে। কান্না একদম থেমে যায়। শিশু কাঁদে ত মা বলেন, "ওরে, দেখ, কেমন ফরফর করছে!" শিশু সকল বৃত্তি দিয়ে কাক দেখতে থাকে। ঝট্‌ করে তন্ময় হয়ে যায়। এই

একাগ্রতার হেতু তারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করে, ঝট্ করে নিয়ে নেয়। চিত্তে মল না-থাকা এই সহজ একাগ্রতার কারণ। চিত্তশুদ্ধিই স্থায়ী একাগ্রতার মুখ্য ও প্রত্যক্ষ সাধন। বাকী সব বাহ্য উপচার মাত্র।

৯২. সমাধি মানে মূল স্থিতি, বাহ্য সাধনের দরকার সেখানে নাই

বাসনার ভূত যতদিন চিত্তে নাচবে ততদিন কেবল বাহ্য সাধনের দ্বারা একাগ্রতা কিরূপে আসবে? ভোর বেলা, চোখ থেকে ঘুমের আমেজ কেটে গেছে, শৌচ-স্নানান্তে চিত্ত স্নিগ্ধ-সতেজ, দৃষ্টি অর্ধ-উন্মীলিত, আসনে সোজা হয়ে উপবিষ্ট, গুনগুন করে শ্লোকের জপ চলছে, কিংবা কোন মূর্তি, চিত্র, জ্যোতি অথবা জলধারা চোখের সামনে ভেসে উঠছে, কোথাও থেকে শান্ত সঙ্গীতের মধুর তান কানে ভেসে আসছে—এত সব সাত-সতর উপচার করলে না পাঁচ-দশ মিনিটের একাগ্রতা! বাহ্য উপচার থেকে আসা ঐ একাগ্রতা স্থায়ী কি করে হবে? সমাধি যদি আত্মার মূল অবস্থা হয় তবে তা সহজ হওয়া চাই। তার জন্য বাহ্য প্রযত্নের দরকার হওয়ার কথা নয়। কিছু না করলেও তা লাগা চাই, না, থাকা চাই। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, দেখা-শোনা ইত্যাদি ক্রিয়া বলে, তা করার জন্য পরিশ্রম দরকার, প্রযত্ন আবশ্যক। কিন্তু সমাধি ত মূল স্থিতি। সেখানে বাহ্য প্রযত্নের, পরিশ্রমের কি প্রয়োজন?

৯৩. চিত্ত-শুদ্ধি হলে সমাধি লাভ হয়

মহাভারতে একটি বাক্যে বলা হয়েছে—"চিত্ত-শুদ্ধি হওয়ার ছয় মাস পরে সমাধি লাগে।" এর অর্থ এই করতে হবে যে ব্যাসদেবের ধারণামতে

তাঁর চিত্ত-শুদ্ধি হওয়ার ছয় মাস পরে তাঁর সমাধিলাভ হয়েছিল। তা যদি না হবে তবে চিত্ত-শুদ্ধির পরে ছয় মাসের ফাঁক কেন? আর ছয় মাস মানে ১৮০ দিন নয় কি? ১৭৯ দিনে চলবে না? এর অর্থই এই যে চিত্ত-শুদ্ধি পূর্ণ হয় নাই। স্বয়ং ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেন ত তিনি বলবেন, "গীতায় যে কথা বলেছি সে কথাই ঠিক। গীতা বলে, "চিত্ত-শুদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একাগ্রতা লাভ হয়।" সর্ব প্রকার প্রযত্ন ত্যাগ করা যে অবস্থার স্বরূপ তা যে আপনা-আপনি আসা চাই সে কথা না বললেও চলে। আমাদেব বালকোবা* বলে, "আমি চেষ্টা করি তবু মোটেই ঘুম আসে না।" আমি তাকে বলি, চেষ্টা করিস বলেই আসে না। প্রযত্ন ঘুমের অন্তরায়।" চেষ্টা বন্ধ করলে ঘুম আপনা থেকে এসে যায়। একাগ্রতার কথায়ও ঠিক তা-ই। সর্ব প্রযত্ন ত্যাগ করলে পরই সত্যিকার একাগ্রতা, সহজ একাগ্রতা লাভ হয়। একাগ্রতার সাধনসমূহই চিত্তের ওপর পালটা আক্রমণ করে আর ক্ষণিক একাগ্রতার পরে পুনরায় ব্যগ্রতা দেখা দেয়।

৯৪. তা হলেও সাময়িক উপায় হিসাবে বাহ্য সাধনসমূহ উপেক্ষার নয়

কিন্তু সহজ একাগ্রতা না আসা পর্যন্ত বাহ্য সাধনসমূহের দ্বারা একাগ্রতার অভ্যাস করা হবে না, তা নয়। সাধনার কাজে বাহ্য সাধন হতেও সাধকের সহায়তা মিলতে পারে। আর সে সকলের ব্যবহার করা উচিতও বটে। তাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাধকের ব্যবহারের জন্য সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাতঃকাল সাধনার সর্বাপেক্ষা

* বিনোবার মধ্যম ভ্রাতা।

অনুকূল সময়। সে সময়টা অনুপম। সত্ত্বগুণেরই যেন তাহা প্রতীক। অন্ধকার গেছে, আলো ফোটে নাই। দিন রজোগুণের প্রতিনিধি, রাত তমোগুণের। সন্ধিকাল হচ্ছে সত্ত্বগুণের, আত্মার সমতার, প্রশান্ততার প্রতিনিধি। তাই সান্ধ্য উপাসনার বিধি। সে সময়কার দৃশ্য রমণীয়, পবিত্র, উদ্‌বোধক। একাগ্রতার পরীক্ষার তা উপযুক্ত সময়। প্রাতঃকাল বৃথা গেল ত হল সারাদিনের কর্মসারা। অতএব ধ্যানের পক্ষে ঐ সময়টার ব্যবহার নিঃসংশয় শ্রেয়স্কর। কিন্তু চিত্তকে বাইরের ঠেকনা দিয়ে খাড়া করা এক কথা, আর দেওয়ালের মত নিজশক্তিতে ঠায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা, আর এক কথা। অতএব শেষটায় গীতা যে ইঙ্গিত করেছে তাই ঠিক। চিত্ত শুদ্ধ হলে, নির্বিকার হলে নিজ শক্তিতেই তা স্বাভাবিকভাবে সোজা খাড়া থাকবে। আর ঠিক এই ইঙ্গিত পতঞ্জলিও করে রেখেছেন। তাঁর কথায় ধ্যানযোগের জন্য যম-নিয়মের অবলম্বন দরকার। যম-নিয়মগুলি চিত্ত-শুদ্ধিরই সাধন। চিত্ত-শুদ্ধি হলে, প্রসন্নতা লাভ হলে বুদ্ধি স্থির হওয়ার জন্য, একাগ্রতার জন্য ফিকির করতে হয় না। "প্রসন্ন-চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।"

দশম ব্যাখ্যান

এক

৯৫. বুদ্ধি-নাশের অনর্থকারিতা দেখানোর জন্য পাঁচ জীবনাদর্শের অবতারণা

অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা দেখানো হয়েছে যে সংযম দ্বারা প্রসন্নতা লাভ করলে বুদ্ধি স্থির হয় আর অসংযমের কারণে চিত্ত-ক্ষোভ জন্মে বলে বুদ্ধি নাশ হয়—বুদ্ধির স্থিরতা নষ্ট হয়। একথা থেকে সংযমের আবশ্যকতা স্বতই সিদ্ধ হয়। বুদ্ধি-স্থৈর্য লোপ পায় ত এমন কি মহা অনর্থ ঘটবে? —এরূপ উদ্ভট সংশয় মাথায় যদি গজায়ই ত "বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি" বাক্য দ্বারা তার উত্তর দিয়েই রাখা হয়েছে। বস্তুত এরূপ সংশয় কারো মনে জাগা উচিত নয় আর জাগে ত তার উত্তর না দেওয়াই উচিত। তবু গীতা এর উত্তর দিয়েছে, কেবল তা-ই কি, বিশদভাবে বোঝানোর জন্য আরও একটি শ্লোক খরচ করে ফেলেছে। "বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি" একথা বালকেও বোঝে। তবে আর এই বিশেষ প্রয়াস কেন? কিন্তু একে করা হয়েছে নিমিত্তমাত্র। যেগুলিকে আমরা জীবনের আদর্শ বলি এই নিমিত্ত দ্বারা তা নিরূপণ করে নিতে হবে। ঐ সবেরই ভিত যে স্থির-বুদ্ধি এবং (অর্থাৎ) সংযম একথা মনে গেঁথে যাওয়া চাই। সদ্‌ভাবনা, চিত্তের শান্তি, আত্মসুখ এগুলি জীবনের অতুলনীয় মূল্য। আর এই তিনটিই স্থির বুদ্ধির অভাবে বিপন্ন হয়। সুতরাং স্থির-বুদ্ধি এবং তৎ-সাধক সংযমও ঠিক ততটাই মূল্যবান আদর্শ। না, শেষের এই দুইটি স্বতন্ত্র

মূল্যই বটে। কেবল সাধকের ব্যক্তি-বিকাশের জন্যই নয়, গোটা সমাজেব ত্রৈকালিক স্বাস্থ্যের জন্যও এর চাইতে অধিক উপযোগী মূল্যের কিংবা অন্য কোন মূল্যের সন্ধান কোন পথপ্রদর্শক দিতে পারেন নাই। এই সবকেই একটি ক্ষুদ্র সূত্র-বাক্যে ধরা হয়েছে বলে এদের আমি পঞ্চরত্নী বলে থাকি।

৯৬. সর্বাধার-সংযম: সংযম বিনা বুদ্ধি নাই

নাস্তি বুদ্ধির্ অযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তির্ অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥

এইটি সেই সূত্র। অক্ষরে অক্ষরে এর অর্থ এই: "অযুক্তের বুদ্ধি নাই, অযুক্তের ভাবনা নাই। ভাবনা ছাড়া শান্তি নাই, শান্তি ছাড়া সুখ নাই।" সূত্র বলে এর ভাষ্য করা দরকার। এতক্ষণ যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, 'অযুক্তের বুদ্ধি নাই' হচ্ছে তার প্রতিপাদিত ফলিত। অযুক্তের মানে অসংযমী পুরুষের। সংযমে বুদ্ধি আর তার অভাবে বুদ্ধি-নাশ, এই হচ্ছে এই দুই ন্যায়ের অন্বয়-ব্যতিরেকী নিষ্পত্তি। অর্থাৎ এটা পূর্বানুবাদমাত্র। "অযুক্তঃ কাম-কারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে"—অযুক্ত পুরুষ স্বৈরবৃত্তিবশত ফলাশার ফাঁদে আটকা পড়ে, পঞ্চম অধ্যায়ে একথা বলা হয়েছে। এ থেকে অযুক্ত শব্দের অর্থ স্পষ্ট হচ্ছে। অযুক্ত মানে আসক্ত, কামনা-গ্রস্ত, অক্ষর ধরে অর্থ করলে হবে "যুক্তি-রহিত", যুক্তি মানে যে সংযমের যুক্তি তা আমরা আগেই দেখেছি। একে জীবনের চাবি মনে করুন। ব্যক্তির ও সমাজের ঝোঁক সংযমের দিকে কি স্বেচ্ছাচারিতার দিকে তা বুঝেছেন ত তাদের জীবনের স্বরূপ ধরা পড়বে। সুতরাং একে জীবনের প্রথম মূল্য বলতে হবে। স্থির-বুদ্ধি দ্বিতীয় মূল্য—এ থেকেই তার উৎপত্তি।

১৭. পরবর্তী অধ্যাহার* ঃ বুদ্ধি ছাড়া ভাবনা নাই

এ পর্যন্ত এই সূত্রে কোনই অসুবিধা হয় নি। কিন্তু এর পরে সূত্র যেন খণ্ডিত হয়েছে। 'অযুক্তের বুদ্ধি নাই এবং অযুক্তের ভাবনা নাই' পরে এরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে। তা ত্রুটিপূর্ণ। গীতা বলতে চায় যে ভাবনা জীবনের তৃতীয় মূল্য। তা থেকে শান্তি আর শান্তি থেকে সুখ এভাবে পরবর্তী মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে। ভাবনা ছাড়া শান্তি নাই, শান্তি ছাড়া সুখ নাই এরূপ বললে ভাবনার আবশ্যকতা স্পষ্ট হয়। সংযম থেকে সুখ পর্যন্ত শৃঙ্খলের গ্রন্থিক্রম দাঁড়াল এই—সংযম, ভাবনা, শান্তি, সুখ। কিন্তু মাঝখানে বুদ্ধি কেন চাই? বুদ্ধির ও ভাবনার কোনই সম্বন্ধ দেখানো হয় নি। তার ফলে বুদ্ধি অবান্তরই থেকে গেছে। সংযমের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করার দরকার ছিল ত বুদ্ধিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে এই সূত্র দ্বারা তা করা যেত। কিন্তু অভীষ্ট তা নয়। সংযমের আবশ্যকতা আছে ত বটেই, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা তা দেখানো আবশ্যক ছিল। যে দিক হতেই দেখেন, এই বাক্যটি অকারণ মনে হয়। অতএব বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল এরূপ 'নাস্তি বুদ্ধির্ অযুক্তস্য ন চাবুদ্ধস্য ভাবনা'—সংযম ব্যতীত বুদ্ধি নাই, আর বুদ্ধি ব্যতীত ভাবনা নাই। কিন্তু আজ যেমন পাচ্ছি তেমনটিই ঠিক একথা ধরে নিয়ে "স্থিতস্য গতিশ্ চিন্তনীয়া" এই ন্যায় অনুসারে তাতেই সুসঙ্গত অর্থ করতে হবে। তাই "নাস্তি বুদ্ধির্ অযুক্তস্য, অতএব ন চ অযুক্তস্য ভাবনা" এভাবে 'অতএব' শব্দের অধ্যাহার কল্পনা করে কাজ চালাতে হবে। সবটা মিলে অর্থ এরূপ দাঁড়াল—"সংযম ছাড়া বুদ্ধি নাই, বুদ্ধি ছাড়া ভাবনা নাই, ভাবনা ছাড়া শান্তি নাই, শান্তি ছাড়া সুখ নাই।"

* অধ্যাহার—অনুক্ত পূরণ

দুই

৯৮. অধ্যাহারের মাধুর্য : বুদ্ধি থেকে ভাবনা পৃথক নয়। পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধিই ভাবনা

সংযম থেকে সুখ পর্যন্ত অখণ্ড শৃঙ্খল রচনাকালে মাঝখানে একটি বলয়ের সংযোগ কি করে বাদ গেল ?—এখানে এরূপ সংশয় জন্মাবে। এর উত্তর এই যে ভগবান এখানে বুদ্ধি ও ভাবনার যেন অদ্বৈত কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এই কল্পনাতে এক বিশেষ দর্শন রয়েছে। ভাবনা মানে 'পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি', বুদ্ধির পরিপক্কতা—এটাই ছিল ভগবানের অভিপ্রায়। বুদ্ধি এতটা পরিনিষ্ঠিত হয়েছে যে এখন আর তার বিচারের দরকার নাই—অর্থাৎ তাকেই ভাবনা বলে।

৯৯. পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি-রূপ ভাবনার উদাহরণ

কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধি এতই দৃঢ় হয়ে যায় যে পরে বিচার করার আর দরকারই থাকে না। 'খুন হয়েছে' শুনতেই লোকে নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেলে 'কী বিশ্রী'। একে ভাবনা বলে। এরূপ কতকগুলি ভাবনা সমাজের মনে গেঁথে গেছে। সে সকলের পুনর্-বিচারের দরকার নাই। মানব-সমাজ সে সম্বন্ধে লাখো বার বিচার করে নির্ণয় করে রেখেছে। ভারতের যে কোন সমাজের লোককে জিজ্ঞাসা করুন, 'মদের কি কোনই গুণ নাই ? মাত্রা রেখে খেলে ক্ষতি কি ?' তার উত্তরে সে বলবে, 'ও সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। তোমার কথা আমার মাথায় ঢুকছে না।' হাজারো পরীক্ষার পরে আমাদের পূর্বজগণ এই নির্ণয় করে রেখে গেছেন। কোরানে বলা হয়েছে, 'শরাবে লাভ কম, লোকসান

বেশী'। এ ত ছিল মূল শাস্ত্রকারদেব তর্কের বিষয়। কিন্তু বুদ্ধি পাকা হয়ে একবার ভাবনায় পরিণত হয় ত পরে তর্কের অবসর থাকে না। তখন তা স্বয়ং-সত্য।

১০০. প্রগত সমাজে এরূপ অনেক দৃঢ়মূল ভাবনা থাকে। তার ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে

বুদ্ধি-পূর্বক পরিচালিত পরীক্ষার ফলস্বরূপ যে সব ভাবনা সমাজে প্রতিফলিত হয়ে গেছে সে সব সমাজের প্রগতির দ্যোতক। যুদ্ধে বহু লোক মারা পড়ে। এই স্থলে মনে হতে পারে—লোকগুলি যখন মারাই গেল তখন তাদেব খেয়ে ফেললে হয় না? বেশ তাজা-তাগড়া, মোটাসোটা। শাস্ত্র যদি বলে মানুষের মাংস ভাল না ত কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষের মাংস মানুষের পক্ষে সহজ-পাচ্য এরূপও ত সাব্যস্ত হতে পারে। অতএব অন্যান্য প্রাণীব ন্যায় মানুষ খেলে অন্নের অভাব অনেকটা মিটবে। যুদ্ধে-মরা লোক খাওয়া চলে এই ভাবটা যদি লোকমনে ঠাঁই পায় তবে সৈনিকেবা মানুষ মারতে সম্ভবত অধিক উৎসাহ বোধ করবে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ঠিক হয়ে গেছে যে মানুষ খেতে নাই। এর দরুন, আমাদের ভাবনা তেমন রূপ নিয়েছে। ঐ ভাবনার পশ্চাতে অনুভব-সিদ্ধ বুদ্ধি রয়েছে। মানুষকে মানুষ মারে এটাই ত খারাপ। কিন্তু মানুষকে মানুষ খেতে পারে এভাব চলে ত তা আরও বেশী অনর্থের হবে। সমাজের পতনের একশেষ হবে। একথা লোকের মনে এমন গেঁথে গেছে যে এখন আর তর্ক-বিতর্কের স্থান নাই। সদ্‌ভাবনার এটি উত্তম উদাহরণ। যে সমাজে এরূপ নানাবিধ উন্নত ভাবনা বজ্রলেপের মত বসে গিয়েছে সে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। যে সমাজে বিচারের কখনও শেষ নাই, যে কোন ব্যাপারে

সর্বক্ষণ যেখানে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, যেখানে বুদ্ধি পরিনিষ্ঠ নয়, সে সমাজে সদা অশান্তি লেগে থাকে।

১০১. কিন্তু সমাজের অনুপ্রবিষ্ট ভাবনা যে সব সময় বুদ্ধি-যুক্ত তা নয়। সুতরাং ভাবনার সুনিপুণ সংস্কার আবশ্যক

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি ভাবনা সমাজে স্থির হয়ে গেছে। সেগুলির দ্বারাই সামাজিক জীবন সুব্যবস্থিত থাকে ; সমাজের সাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু সব ভাবনাই বুদ্ধি-যুক্ত তা নয়। তাই বুদ্ধির আলো ফেলে তাদের যাচাই করে নিতে হবে। বুদ্ধির যে অংশ মূলত বুদ্ধি-যুক্ত দেখা যাবে তা বজায় রাখতে হবে। আর অবুদ্ধির অংশটাকে ছেঁটে বাদ দিতে হবে। ভাবনার সমূল উচ্ছেদ যেন করবেন না। তাদের শুদ্ধ করে নিতে হবে, বিকাশ করতে হবে। নইলে সমাজে কোনই স্থির মূল্য থাকবে না। তখন তার তাল সামলানো দায় হবে। অশান্তি ও অব্যবস্থা দেখা দেবে। সামাজিক সদ্‌ভাবনার গুটিকয়েক উদাহরণ আমরা দিয়েছি। আরও কয়েকটি দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

১০২. সংশোধ্য ভাবনার একটি উদাহরণ: মাংসাহার-নিবৃত্তি

আমাদের সমাজ এই সব ভাবনা থেকে মাংসাহারকে হেয় জ্ঞান করে। তার ফলে কয়েকটি জাতের সমস্ত লোকে মাংসাহার ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ঐ সব জাত নিজেদের উঁচু বলে মনে করতে লাগল।

এখানেই যদি শেষ হত তবুও ভাল ছিল, ব্যাপারটা গড়াল আরও অনেক দূর—কতকগুলি জাত অস্পৃশ্য বলে গণ্য হল। এই উঁচু-নিচু ভাবনায় আরও কতকগুলি বিষয় ঢুকে গেল। তবুও এতে কতকগুলি জাতের মাংস-বর্জনরূপ ভাবনার অংশ বিদ্যমান। এই ভাবনা ঠিক। কিন্তু তা থেকে যে উঁচু-নিচু ভেদ জন্মেছে তা বাদ দিয়ে ওটিকে গ্রহণ করতে ও পরিপুষ্ট করতে হবে।

১০৩. আর একটি উদাহরণ : **অন্নদান সম্বন্ধে শ্রদ্ধা**

এরূপ আর একটি ভাবনা আমাদের সমাজে আছে—অন্নদানের মহত্ত্ব। সকল দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ ও নির্দোষ বলে গণ্য। সমাজে ঐ ভাবনার বিনিয়োগ করতে গিয়ে আজ তা বিকৃত ও অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার মূলে যে সদ্ অংশ আছে তা বিসর্জন দেওয়া ইষ্টের হবে না। ত্রুটি দূর করে তাকে পরিপুষ্ট করতে হবে। অন্নদানকে শ্রেষ্ঠ দান বলে মেনে নেওয়ায় একথাই স্বীকার করা হয়েছে যে ক্ষুধার্ত লোকমাত্রেরই অন্নে অধিকার আছে। তাকে অন্ন দেওয়া সমাজের কর্তব্য। অন্নদান সরাসরি লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছে। অন্যবিধ সহায়তা দিতে গেলে এজেন্সি, মারফত, বক্রতা এসে পড়ে। তবে এদিকে সজাগ থাকা চাই যে যার পেটে ভাত আছে তাকে যেন আরও না দেওয়া হয়, অন্নদানে বাড়াবাড়ি যেন না হয়, আলস্যের প্রশ্রয় যেন তা থেকে না মেলে। মূল ভাবনা বজায় রেখে বিনিয়োগের পদ্ধতিতে ইষ্ট (কল্যাণকর) সংস্কার করা চাই। বুদ্ধির আলোতে ভাবনাকে শুদ্ধ করে নেওয়ার সামাজিক দৃষ্টি এ থেকে আমরা পাই।

১০৪. স্থির-প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবনা শান্তি-দায়ী

ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা দেশে থাকবেই। সে সব যদি পরিশুদ্ধ হয় তবে দেশে শান্তি বিরাজ করে। পরিশুদ্ধ না হলে চারদিকে অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু অশান্তি কেউ চায় না। তাই তখন আবার শান্তির জন্য নানা প্রকারের কৃত্রিম ও হিংস পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। আজ হচ্ছেও তাই। স্বাভাবিক রীতি দ্বারা সমাজে শান্তি রাখতে হলে শুদ্ধ ভাবনা বজায় রেখে তার বিকাশ করে যেতে হবে আর অশুদ্ধ ভাবনা নিঃশেষ করতে হবে। অসদ্-ভাবনা কি আর সদ্-ভাবনা কি তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব একমাত্র স্থিত-প্রজ্ঞের। কারণ তাঁর বুদ্ধি স্থির ও তটস্থ হয়েছে বলে কোন ভাবনা সৎ, কোন ভাবনা অসৎ তা তিনি যাচাই করতে পারেন। কলা, সঙ্গীত, সৌন্দর্য-বিষয়ক কল্পনা, মনো-বিনোদনের সাধন, ধার্মিক উৎসব, পূজাবিধি ইত্যাদি সবই ভাবনার আওতায় পড়ে। দেশের জীবন-বিকাশ করতে হলে এই সব অংশের উপযুক্ত বিকাশ হওয়া আবশ্যক। এ সব বিষয়ের এলোমেলো কল্পনা যদি দেশে চালু হয় তবে দেশ অধঃপাতে যাবে। অব্যবস্থায় দেশ ছেয়ে যাবে। অর্থাৎ এই সকল বস্তুকে স্থির-বুদ্ধির স্তম্ভের উপর খাড়া করতে হবে। স্থির-বুদ্ধি মানে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি। তাতে, আত্মজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, সৃষ্টি-বিজ্ঞান, সৃষ্ট-পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত, চিন্তন-শাস্ত্র ইত্যাদি সব এসে যায়। এরূপ স্থির বুদ্ধির শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর সামাজিক ভাবনাসমূহের প্রতিষ্ঠা হলে, আপনা থেকেই শান্তি বিরাজ করবে। শান্তিস্থাপনের জন্য কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে না। এরূপ সমাজ অহিংস থাকবে। সর্বরাষ্ট্রীয় বিধানও এরূপ হবে যে শান্তিই হবে তার স্বাভাবিক লক্ষণ।

১০৫. অতএব স্থিত-প্রজ্ঞের নেতৃত্ব মেনে চলা দরকার

এই জন্য, যে বুদ্ধি থাকলে লোকে পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তির উপর অর্পণ করবে, সমাজে সেই বুদ্ধির উদ্রেক করা দরকার। যে সমাজের লোকের এতটা বুদ্ধি হয় নি, বা সমাজের মুখ্যেরা তাদের তা দেয় নি, সে সমাজে পথপ্রদর্শনের কাজ অস্থিত-প্রজ্ঞ নেতার হাতে থাকে। স্থিত-প্রজ্ঞের পথ-প্রদর্শনাধীনে সামাজিক নীতির ভিত্তি হবে সংযম। বিজ্ঞানের দ্বারা জীবনের যথার্থ সত্য খুঁজে বের করে তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কলা মানে হৃদয়-বিকাশের ভাগ। বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে কলা সমাজের সাম্যরক্ষার উপযোগী সমাজ-বিধান রচনা করবে এবং এই যোগের দ্বারা সমাজে স্থায়ী শান্তি ও সন্তোষ বিরাজ করবে।

একাদশ ব্যাখ্যান

এক

১০৬. ভাবনা শব্দের আরও একটু বিশ্লেষণ

ভাবনা শব্দের আর একটু বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক। বৈদ্যশাস্ত্রে ভাবনা বলতে ঘোঁটা, গোলা বা পুটে চড়ানো বোঝায়। হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ ঘাঁটা হয়। মর্দনে ঔষধের শক্তি বাড়ে, গুণ বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধির পরিচালনা করলে তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে তা ভাবনায় পরিণত হবে। স্থিত-প্রজ্ঞের বুদ্ধি পরিণত হয়ে যায় বলে তাঁর জীবনে কেবল ভাবনাই থাকে। ভাবনার দ্বারা তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে ভরে যায়। বুদ্ধি ও ভাবনার আর একটা পার্থক্য আছে। বুদ্ধি কেবল দিশা দেখায়। ভাবনা দিশা দেখায় আর কাজও করে। কার্যক্ষম ও কার্যকরী হলে বুদ্ধি ভাবনা হয়ে যায়। বুদ্ধিকে ভাবনায় রূপান্তরিত করতে হলে তাকে আলোড়ন করতে হয়। 'সর্ব ভূতে আত্মা' স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে এটা তর্করূপ বুদ্ধি নয়, অনুভব-রসে-সিক্ত ভাবনা। তাই গোটা সমাজের প্রতি তার বাৎসল্য জন্মে। আর সে বাৎসল্য মায়ের বাৎসল্যের মতই স্বাভাবিক। সমাজের সেবা পর্যন্ত তখন সহজ স্বভাববশে ঘটতে থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞের জীবন বুদ্ধিময়, সেস্থলে তার জীবনে ভাবনার স্থান আর কোথায় থাকছে? —এরূপ সংশয় করার কোন কারণ নাই। কারণ বুদ্ধি স্থির হল কি তা ভাবনা হয়ে গেল—এ আমরা আগে দেখেছি। স্থিতপ্রজ্ঞের জীবন বুদ্ধিময় তাই তা ভাবনাময়।

১০৭. বুদ্ধি-প্রধান বনাম ভাব-প্রধান এই ভেদ স্থিতপ্রজ্ঞে লোপ পায়

কিন্তু এরূপ সংশয় মনে জাগার কারণ আছে। আজকাল অনেক সময় ভাবনা শব্দের ব্যবহার বুদ্ধির বিপরীত অর্থে করা হয় এবং বুদ্ধির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। অমুক লোক ভাবনা-প্রধান আর অমুকে বুদ্ধি-প্রধান ইদানিং এরূপটা আমরা বলে থাকি। তার মানে আমরা একথাই বলতে চাই যে একেতে ভাবনা বেশী ও বুদ্ধি কম আর অন্যেতে বুদ্ধি বেশী ও ভাবনা কম। ভাবনা-প্রধান এই শব্দের অর্থ এখানে এই যে মন নিরঙ্কুশ, মনের ওপর বুদ্ধির অঙ্কুশ নাই। ভাবনা শব্দ এখানে মনকে লক্ষ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গীতার উপদেশে ভাবনা শব্দ দ্বারা হৃদয়ে স্থিত বস্তুর নির্দেশ করা হয়েছে। গীতার ভাবনা মনের বিকার নয়, হৃদয়ের গুণ। বস্তুত হৃদয় ও বুদ্ধি এরূপ পার্থক্য গীতা করে না; বরং বুদ্ধির একেবারে নিভৃততম ভাগকে গীতা হৃদয় বলে। "হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম", "ঈশ্বরঃ সর্ব-ভূতানাং হৃদ্-দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি" বচনে হৃদয়ের অর্থ বুদ্ধির ভিতরের ভাগ। কাউকে যখন আমরা ভাবনা-প্রধান বলি তখন বস্তুত একথাই বলি যে সে বিকার-প্রধান। যে ভাবনা বুদ্ধির শাসনাধীন নয় তা বিকারই বটে। সেই বুদ্ধিতে গীতার দরকার নাই। উল্টো, কাউকে যখন আমরা বুদ্ধি-প্রধান বলি তখন একথাই বলতে চাই যে তার অন্তঃকরণে আর্দ্রতা জন্মে নাই, হয়েছে কেবল তর্ক-শক্তির বিকাশ। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতি একেবারেই আলাদা। সে নিজ বুদ্ধি হৃদয়কে সমর্পণ করে দেয়। বুদ্ধিকে ঘেঁটে ঘেঁটে সে তাকে হৃদয়ে রূপান্তর করে, তার বুদ্ধি হৃদয়ে মিলে যায়; বুদ্ধি ও ভাবনা পরস্পরে একরস হয়ে যায়।

১০৮. বুদ্ধিকে ভাবনার রূপ দেওয়ার উপায়ঃ জপ, ধ্যান ও আচরণ

বুদ্ধিকে ভাবনায় রূপান্তর করার উপায়ের কথা সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। এখন কয়েকটি বিশেষ শাস্ত্রীয় প্রয়োগের বিচার করা দরকার। জপ এদের মধ্যে প্রথম প্রয়োগ। জপ বলতে সেরেফ বাণী দ্বারা উচ্চারণ নয়। সেই বিচার মনেও মন্থন করা দরকার। বাণী এই কাজের সহায়ক। মননের সদৃশ হলেও ঐ ক্রিয়া মনন নয়। মনন নির্ণয়ের জন্য। যে নির্ণয় পূর্বে করা হয়েছে জপের দ্বারা তা দৃঢ় করতে হয়। এই কার্য বাণী দ্বারা হয়ে থাকে। এমনটাই জপের ও মননের ব্যবধান। এই ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেন ত দুই ক্রিয়াই এক। ধ্যান দ্বিতীয় প্রয়োগ। ধ্যান মানে বিচারে তন্ময়তা, তার অনুকূল উপাসনা। এ থেকেই তৃতীয় প্রয়োগ আচরণের আরম্ভ। বিচারের অনুকূল করে সমগ্র জীবনের রচনা হচ্ছে তার স্বরূপ। এই ভাবে (১) জপ, (২) ধ্যান, (৩) আচরণ, এই তিন প্রয়োগের দ্বারা বুদ্ধির রূপান্তর হয় ভাবনায়।

১০৯. ভাবনা মানে ভক্তি এরূপ অর্থও নিষ্পন্ন হয়। ভক্তি ছাড়া শান্তি নাই, শান্তি ছাড়া সুখ নাই

এই বিষয়ের বিচার আর এক দিক হতে করা যেতে পারে। স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি। বারংবার মন্থনের ফলে আত্মজ্ঞান যখন ধাতস্থ হয় তখন তা ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অতএব ভাবনা শব্দের অর্থ এখানে ভক্তি করা যেতে পারে। বোধ প্রেমের রূপ ধরে মানে জ্ঞান ভক্তির রূপ ধরে। বোধ স্থির হলে তা এত ভাল লাগে যে মন তাতে নিত্য নিরন্তর বিচরণ করতে থাকে। এরূপ হলে বোঝা যাবে যে বোধ

প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব ভাবনার অর্থ ভক্তি করা যাবে। একথা তখন বোঝা যাবে যে প্রেম বিনা কিংবা ভক্তি বিনা শান্তি নাই। বোধ যখন অত্যন্ত প্রিয় হয় তখন অনুক্ষণ তার চিন্তন চলে, মনকে তা ঘিরে ফেলে, মনকে যেন মন্ত্রে অভিভূত করে। এরূপ হলে অশান্তির ছোঁয়াচও লাগে না। গাছের মূল সব সময় জল পায় ত তা সবুজ-সতেজ থাকে। তদ্রূপ অন্তরের গভীরে যদি বোধের ঝরনা বইতে থাকে, তা যদি প্রেমের রূপ ধারণ করে, আর সতত প্রেম-রসে আর্দ্র হতে থাকে ত জীবন চির-সতেজ থাকে। আপদ আসে ত তা সম্পদ হয়ে যায়। তার দ্বারা শান্তি বাড়ে। এভাবে বোধ ও ভক্তির সম্বন্ধ অভেদ্য। বোধ ছাড়া ভক্তি নাই, ভক্তি ছাড়া শান্তি নাই, শান্তি ছাড়া সুখ নাই।

দুই

১১০. কিন্তু সুখ মানে মনের সুখ নয়। মনের সুখ এক, ব্যক্তির সুখ আর এক

কিন্তু সুখ মানে মনের সুখ নয় মনের সুখ-দুঃখ এক। ব্যক্তির সুখ-দুঃখ আর এক। মনের সুখ-দুঃখে ব্যক্তিরও সুখ-দুঃখ হবে এমন কোন কথা নাই। আজ কত লোকে দেশের জন্য মানসিক দুঃখ সহ্য করছে। তাতে মনের কষ্ট হয়েছে কিন্তু তাদের সুখই হয়েছে। কারণ তাতে আছে কল্যাণের ভাব। জিভে যা মিঠে লাগে বা তেতো লাগে, ব্যক্তিরও তা মিঠে বা তেতো লাগবেই তা নয়। ওষুধ জিভের কাছে তেতো, ব্যক্তির লাগে তা মিঠে। কল্যাণকর মনে হলে লোকে মানসিক দুঃখ সানন্দে স্বীকার করে। মানসিক সুখ-দুঃখের ব্যাখ্যা থেকে জীবন-দৃষ্টি হতে করা সুখ-দুঃখের ব্যাখ্যা আলাদা। শরীরের সুখ স্বাস্থ্যে। শরীরে

বলের বিকার জন্মা, উপচে পড়ার মত হওয়া, দেওয়ালে টক্কর খাওযার জন্য নিশপিশ করা এসব স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। নিজের বল সে নিজেতে সামলাতে পারে না। বল নিজেই রোগ হয়ে দাঁড়ায। শরীরে সাম্য বজায় থাকার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য এক, বলের আতিশয্য আর এক। স্বাস্থ্যে সুস্থতা থাকে। অসংযত বলে থাকে ক্ষোভ। তদ্রূপ যে সুখে মনে হর্ষ জন্মে, তা যথার্থ সুখই নয়। জীবনের যথার্থ সুখ আলাদা। তার নিবাস শান্তিতে, চিত্তের অস্থিরতায় নয়। নির্বিকারিতা থেকে তার উৎপত্তি। নির্বিকারিতা থেকে বোধ, বোধ থেকে ভক্তি বা নিষ্ঠা, তার পরে শান্তি আর পরে অক্ষয় সুখ—এই এদের ক্রম।

১১১. আছি এ ভাবটাই যথার্থ সুখ। তাতে অরুচি নেই

অন্যরূপ সুখের দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়। তার ফলে বিতৃষ্ণা জন্মে। নিত্য একই জিনিসে অরুচি ধরে। মন পরিবর্তন চায়। আত্মার সুখ এরূপ সুখ যে তাতে অরুচি জন্মে না। মন চায় নিরন্তর যেন তা ওরূপই থাকে। তাতে অরুচি নাই। সঙ্গীত যতই মধুর হোক, তা যদি চব্বিশ ঘণ্টা কানে আসতে থাকে ত জীবন অতিষ্ঠ হয়। রংএর সম্বন্ধেও সেই কথা। চিত্রবিচিত্র রং দেখতে কিছু সময় বেশ লাগে, কিন্তু ঐ রঙের খেলা অনুক্ষণ চোখের ওপর চলে ত চোখ ক্লান্ত না হয়ে যায় না। বিশ্রামের জন্য তখন চোখ আকাশের রঙহীন নীল রংএর আশ্রয় নেয়। আকাশের নীল রংএ চোখ ক্লান্ত হয় না। তাই ত উপাসনায় 'গগন সদৃশ' বলে ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে। অন্য চকচকে রঙ ও আকাশের সৌম্য রঙে যে ব্যবধান, অন্যান্য সুখে আর আত্মার সুখে ঠিক সেই ব্যবধান। আত্ম-সুখ মানে আমার থাকারূপ অখণ্ড সুখ। আমি থাকছি

না ক্ষণকালের জন্যও এরূপ কেউ ভাবে না। শরীর যাক একথা ভাবতে পারে। অমুক জায়গায় থাকতে ভাল লাগে না, এরূপও ভাববে। কিন্তু আমি আদবে থাকব না, এরূপ মনে করে না। আপন অস্তিত্ব বিষয়ে বিরক্তি আসা সম্ভব নয়। বাকী সব সুখ এই অস্তিত্বের বাইরেকার বিকার। অস্তিত্বের বোধ নিজেও বিকার।

১১২. কুম্ভকের দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বোঝা যাবে

তাই যোগ-শাস্ত্রে কুম্ভকের সংকেত দ্বারা আত্মার 'কেবল অস্তিত্বের' দর্শন করানো হয়। নিঃশ্বাস ভিতরে নেওয়ার ক্রিয়া শেষ হয়েছে, প্রশ্বাস বাইরে ছাড়ার ক্রিয়া শুরু হয় নি—মধ্যেকার সেই অতিসূক্ষ্ম উভয়বৃত্তি-বর্জিত নিষ্ক্রিয়, তটস্থ ক্ষণের কথা মনে করলে 'কেবল অস্তিত্ব' যে কি তা বোঝা যাবে। তাই এই মুহূর্তকে যতটা পারা যায় দীর্ঘ করার স্থূল প্রযত্ন—যাকে দীর্ঘ কুম্ভক বলা হয়—করার জন্য কোন কোন দিশেহারা সাধক ছটফট করে থাকে। বস্তুত কুম্ভক দীর্ঘ করার দরকার নাই। দরকার, কুম্ভক-দৃষ্টান্ত দ্বারা যে আত্মস্থিতির সংকেত করা হয়েছে তা বুঝে নেওয়া ও সে অনুভবে সতত স্থির থাকা। কুম্ভক দৃষ্টান্ত মাত্র। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। জ্ঞানদেব অমৃতানুভবের এক জায়গায় এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 'রাত শেষ হয়েছে, দিনের আরম্ভ হয় নি': 'নদীতে বর্ষার প্লাবন মন্দ হয়েছে, গ্রীষ্মের ক্ষীণতা আসে নাই'—এগুলি যেমন দৃষ্টান্ত, কুম্ভকও তেমন দৃষ্টান্ত। শারীরিক কারণে কুম্ভক-প্রক্রিয়া দীর্ঘ করতে হয় ত আলাদা কথা। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মধ্যস্থ দশার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। লক্ষ্য হচ্ছে একমাত্র নিরুপাধিক মধ্যস্থ অবস্থা। গোটা জীবনটাকে সকল রকম উপাধি হতে মুক্ত করা দরকার। আমি অমুক, আমি তমুক, এরূপ সবকিছু বিশেষণ

ঝাঁটিয়ে দূর করা চাই। সকল দোষ-গুণ বাদ দেওয়ার পরে মানুষে যে মূলীভূত উপশান্ত স্বরূপ অবশিষ্ট থাকে তাই সুখ। শান্তিময় সুখ যে সাধারণ সুখ থেকে আলাদা তা দেখানোর জন্য তাকে নিত্য-সুখ, আত্ম-সুখ, চিত্-সুখ ইত্যাদি বলা হয়েছে। তাই যথার্থ সুখ এই কারণে তাকে সত্য-সুখও বলা হয়। সচ্চিদানন্দ শব্দে তাই সূচিত হয়। বুদ্ধি আত্মাতে স্থির হলে সেই সুখ লাভ হয়। তাই যার প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে তার জীবন সুখী।

১১৩. আত্ম-সুখানুভূতির ব্যবহারের সঙ্গে বিরোধ নাই। আত্মবোধ বাহ্য উদ্‌যোগে যেন খরচ না হয়ে যায়—বস্

এখানে প্রশ্ন উঠবে, আত্মার বাইরের বিষয়ে যদি বুদ্ধিই প্রয়োগ না করা হবে তবে সে ব্যাপার চলবে কি করে? উদাহরণার্থ, কেউ চামড়ার ব্যবসা করছে। তাতে সে যদি বুদ্ধি না খাটায় ত সে কাজ হবে কিরূপে? আর সেই বা করবে কি করে? বুদ্ধি যদি আত্মায় স্থির হল ত বাইরের কাজ ঠিকমত চলবে কি ভাবে? সাধারণ ব্যবহারে যে বুদ্ধির উপযোগ হয় তা বুদ্ধির এক শক্তি। তাকে তর্ক বলা যাবে। বাইরের ব্যাপারে তা থেকে কাজ নিতে বাধা নাই। কিন্তু 'অহং-বুদ্ধি' নামক বুদ্ধির অন্তরতম ভাগকে আত্মায় স্থির রেখে আমাদের তটস্থ থাকতে হবে। আত্মবোধ যেন বাইরের ব্যাপারে খরচ না হয়ে যায়। বাইরের ব্যাপারে সাধারণ বুদ্ধি লাগিয়ে আত্মবোধে লীন থাকা ত কঠিন বটেই, কিন্তু তা বলে তা ছাড়া ত চলে না। নিরন্তর প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধি লাভ হবে। কারণ, তা কৃত্রিম নয়। অতএব তা সিদ্ধ হবে এ সুনিশ্চিত।

১১৪. আত্মবোধ খণ্ডিত না হয়—তার উপায়। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তার ফল ফলতে দেবে না

এর আমি একটা পথ খুঁজে বের করেছি। বাহ্য বস্তুর পরিণাম সঙ্গে সঙ্গে হতে দেবে না। পরে হয় হোক, কিন্তু সেই মুহূর্তে নয়। কেউ পরিহাস করে ত সঙ্গে সঙ্গে হাসবে না। কেউ চড় মারে ত তখনই কাঁদবে না; সেই মুহূর্তটায় মনে করবে ঈশ্বরের হাতের স্পর্শ তোমার লাভ হয়েছে। পরে আঘাত-লাগা চোখে জল আসে ত আসুক। মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছে ত প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেবে। শান্তি টলতে দেবে না! মন এতটা বশে এসে গেলে বাকীটা আপনা-আপনি হবে।

দ্বাদশ ব্যাখ্যান

এক

১১৫. ইন্দ্রিয়ের অনুগামী মন বুদ্ধিকেও টেনে নেয় অতএব সংযম চাই

এর পরবর্তী শ্লোকে সংযমের আবশ্যকতা পুনরায় আর এক দিক থেকে দেখানো হয়েছে :

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্ মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ নাবমিবাম্ভসি॥

ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন ইচ্ছে চলছে, মন তাদের পিছনে ছুটছে, এরূপ অবস্থায় বুদ্ধি স্থির ও তটস্থ থাকতে পারে না। মন ইন্দ্রিয়ের দিকে গেলে, ইন্দ্রিয় ও মন মিলে তাদের পক্ষ প্রবল হয়। তখন বুদ্ধি নিজ কার্য ছেড়ে দেয়। কায ছাড়ে বলে নষ্ট হয়ে যায়, তা নয়। বুদ্ধি অবুদ্ধি হতে পারে না। তখন তা হয় কুবুদ্ধি। তখন তা অবুদ্ধি অপেক্ষাও অধিক অনর্থকর হয়ে দাঁড়ায়। মন বুদ্ধির পক্ষ নেয় ত বুদ্ধির পক্ষ বলবান হয় আর ইন্দ্রিয়সমূহকে তাদের পিছনে চলতে হয়। বুদ্ধির অনুকূলে মন আর মনের অনুকূলে যদি ইন্দ্রিয় চলে তবে জীবনের সকল ব্যবহার আত্মার অনুকূল হয়। উল্টো, ইন্দ্রিয়ের পিছনে মন আর মনের পিছনে যদি বুদ্ধি চলে তবে তারা অশোভন কাজ করতে থাকে আর মনের পক্ষ-সমর্থনে কুতর্কের জাল বোনে। সে অবস্থায় জীবনের সকল ব্যবহার আত্মার প্রতিকূল হয়।

১১৬. বুদ্ধি নৌকার মত তারক কিন্তু মনের প্যাঁচে পড়ে ত তাও হয় মারক

পূর্বে বুদ্ধিনাশের পরম্পরার আলোচনাপ্রসঙ্গে বিষয়-চিন্তন থেকে প্রথমে মনের ওপর আক্রমণ হয় একথা এক শ্লোকে বলে নিয়ে পরে কিভাবে মোহ আদি জন্মে আর কিভাবে বুদ্ধিতে তার আঁচ লাগে সেকথা আর এক শ্লোকে আলাদা করে বলা হয়েছে। তারই বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। ঘোড়সওয়ারের হাতে লাগাম আর লাগামের তাবে ঘোড়া থাকে ত ঘোড়সওয়ার অনায়াসে গন্তব্যে পৌছে যায়। তার উল্টো, ঘোড়ার তাবে লাগাম আর লাগামের তাবে সওয়ার হয় ত গন্তব্যে পৌছোনোর আশা থাকে না, কঠোপনিষদে এরূপ বিশ্লেষণ আছে। সে কথাই নৌকার উপমা দিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে। বুদ্ধি নাওয়ের মত তারক। কিন্তু তা যদি বাতাসের বশে আসে তবে পার করার শক্তি তার থাকে না। বুদ্ধি মনের খপ্পরে পড়ে ত তার তারক শক্তি নষ্ট হয়ে যায় আর তা ডোববার হেতু হয়।

১১৭. বুদ্ধি ও মন বরাবরের মত আলাদা থাকতে পারে না। হয় বুদ্ধি মনের বশ হবে নয়ত মন বুদ্ধির বশ হবে। দ্বিতীয়টি শ্রেয়স্কর

মন ইন্দ্রিয়ের পিছনে দৌড়ালেও বুদ্ধিতে ছোঁয়াচ লাগবে না এরূপ কোন উপায় থাকত ত আমরা বলতে পারতাম, মন ইন্দ্রিয়ের পিছনে দৌড়াতে চায় ত যেমনটা খুশি দৌড়াক তাতে আসে-যায় না। বুদ্ধি ও আত্মার পক্ষ প্রবল হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে মন ইন্দ্রিয়ের পিছনে ছুটে বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেও কোন পরোয়া নেই। লোকে

বলে থাকে—বিষয়-বিলাস করি বটে তা হলেও আমাদের বুদ্ধি তার পাকে জড়িয়ে যায় না। বিচার-কালে সেই বিষয় ভুলে গিয়ে নির্লিপ্ত-ভাবে বিচার করি। কিন্তু এটা ভ্রম। তা হতে পারে না। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনের এক জোট বেঁধে দিয়ে নিজে আলগা থাকা যায় এইটে সম্ভব। কারণ আত্মা একেবারে আলাদা,—আত্মা ও বুদ্ধির মাঝখানটা ফাঁকা। তার মধ্যে দেওয়াল খাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় পৌছলেই তা সম্ভব। এরই নাম বেদান্ত। কঠিন ত এ বটেই তবে অসাধ্য নয়। মন ও বুদ্ধির মাঝখানটা শূন্য নয়। তারা পরস্পরসংলগ্ন। অতএব আত্মা এক দিকে আর বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অন্য দিকে এরূপ দুই ভাগ যেমন নিঃসংশয়ে করা যায়, তদ্রূপ আত্মা ও বুদ্ধি এক দিকে আর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অন্য দিকে এরূপ ভাগ করার জো নাই। তবেই, এক ত ইন্দ্রিয়সমূহের অধীন মন আর মনের অধীন বুদ্ধি এরূপ হতে পারে, নয়ত বুদ্ধির অধীন মন আর মনের অধীন ইন্দ্রিয়সমূহ এরূপ হতে পারে। এর মধ্যে দ্বিতীয় পথ ইষ্ট বা শ্রেয়স্কর, একথাই এখানে বলা হয়েছে।

১১৮. জ্ঞানদেবের বিশেষ সংকেত: জ্ঞানীদেরও অসাবধান হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে অবাধে ছেড়ে দেওয়ার জো নাই

কিন্তু এই শ্লোকে কেবল একথাই যদি বলা হত তবে বিশেষ কিছুই বলা হত না। অতএব এর কোন বিশেষ অর্থ আছে। তা সূক্ষ্মভাবে খুঁজে দেখা দরকার। জ্ঞানদেব এই অর্থ স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে এই শ্লোকে ভয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষ যখন প্রায় স্থিত-প্রজ্ঞ অবস্থায় পৌছে যায় তখনও তার অসাবধান হওয়া উচিত নয়, এই ইঙ্গিত

এখানে করা হয়েছে। জ্ঞানদেব বলেছেন, "প্রাপ্তেং হি পুরুষেং। ইন্দ্রিয়েং লালিলীং জরী কবতিকেং। তরী আক্রমিলা জাণ দুঃখেং। সাংসারিকং॥" প্রাপ্ত মানে পৌঁছে গিয়েছে এমন পুরুষ, অর্থাৎ গন্তব্যে পৌঁছেছে এরূপ পুরুষ। এরূপ স্থির বুদ্ধি পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহের ইচ্ছা পূর্ণ করতে যাবে কেন? তাই 'কবতিকেং' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে যদি কৌতুকে, কুতূহলে, অসাবধানতা হেতু অথবা ভুলক্রমে ইন্দ্রিয়সমূহের রাস আলগা করতে থাকে ত তারই মন তার অপেক্ষা বলবান হয়ে তাকে টেনে নেবে। এই অর্থ জ্ঞানদেব পেলেন কি করে তা বিচার করেন ত তা থেকে তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। বায়ু যেমন নাওকে টেনে নেয়, মন তেমনি 'বুদ্ধি'কে টেনে নেয় একথা এই শ্লোকে বলা হয় নি। বলা হয়েছে 'প্রজ্ঞা'কে টানে। এভাবে বুদ্ধির স্থানে প্রজ্ঞা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যর্থ ই কি ঐ প্রয়োগ? এই প্রজ্ঞা শব্দ হতে জ্ঞানদেব এই ইঙ্গিত পেলেন যে কোন অবস্থাতেই মনকে আলগা ছাড়তে নাই। রামদাসও 'মনচা শ্লোকে' যে অন্তিম উপদেশ দিয়েছেন তা এই: "মনা গূজ রে তূজ হেঁ প্রাপ্ত জালে;"—যা কিছু পাওয়ার ছিল পেয়েছিস, অর্থাৎ তুই গন্তব্যে পৌঁছে গেছিস। তবুও গাফিলি নয়। "পরী অন্তরীং পাহিজে যত্ন কেলে"—রহস্য পেয়ে গেছিস তবুও হাত টান রাখ। ঢিল দিস নে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে বুদ্ধি স্থির হয়ে প্রজ্ঞার রূপ ধরলেও লাগাম শিথিল করতে নাই।

১১৯. বস্তুত জ্ঞানী নিয়মের বাঁধনে সংযমী থাকেন তা নয়। থাকেন স্বভাবে

কিন্তু জ্ঞানদেব অন্য স্থানে একটু অন্যরূপ বলেছেন। "গঙ্গা সমুদ্রালা পোহোঁচলী কীঁ তী মন্দাবতে"। "শত্রূলা জিঁকলেঁ কীঁ তরবারীবরচা

হাত ঢিলা হোতো"। গঙ্গা সমুদ্রের কাছে পৌঁছে ত মন্দগতি হয়ে যায়। শত্রুকে জয় করার পরে তলোয়ারের মুঠি ঢিলে হয়ে যায়। এই উক্তি থেকে একথাই সূচিত হয় যে জ্ঞানীপুরুষদের সাধনার দরকার থাকে না। আর এখানে করছেন সাবধানতার ইঙ্গিত। এই দুইয়ের মিল কি করে করা যাবে? এর মিল এই যে সাবধানতাই জ্ঞানীর সহজ ধর্ম। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই ভাবটাই কিছুটা ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। "আত্মজ্ঞানী স্বচ্ছন্দ আচরণ কিভাবে করবেন? স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করতেও অহংকার লাগবে কি লাগবে না?" তাঁর একথা অর্থপূর্ণ। সংযম আশ্রয় করেই না তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন। অসংযত আচরণ তিনি কি করে করবেন? সংযত আচরণ ত তাঁর স্বভাব হয়ে গেছে। স্থিত-প্রজ্ঞের পক্ষে নিয়ম নিয়ম থাকে না, সংযম সংযম থাকে না। নিয়ম আমার থেকে ভিন্ন, তা আমার মেনে চলতে হবে এরূপ ভেদভাবই তাঁর থাকে না। সূর্য নিয়মবশে ওঠে না, ওঠে স্বভাববশে। গঙ্গা নিযমবশে বয় না, বয স্বভাব-ধর্মে। তদ্রূপই স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতি।

১২০. জ্ঞানীর ত নয়ই, সাধকেরও সংযম বোঝা নয়

ইন্দ্রিয়-সংযম কি তাঁর কাছে বোঝা? উল্টো, ইন্দ্রিয়ের অসংযমই তাঁর কাছে বোঝা। গণিত অধ্যয়ন করে কেউ পারংগত হয়েছে। উত্তম গণিতজ্ঞ হয়েছে। তাই বলে কি সে বলবে যে আমার বেলায় গণিতের নিয়ম এখন খাটিবে না? এখন থেকে আমার বেলায় দুই আর দুই-এ চার হয় না, হয় তিন, এরূপ সে মনে করবে কি? এরূপ যদি সে মনে করে ত তার গণিতই খতম। আর তা তার ভ্রম। সংযম যতদিন বোঝা মনে হবে ততদিন তা অপ্রিয়ই থাকবে। সাধকের তা মনে হয় না। প্রথমটায় সাধকের কাছে সংযম কতকটা তাপদায়ক

হবে সন্দেহ নাই। অতঃ তাপদায়ক বলেই না তার নাম তপ। আসলে সংযমের মূলে যদি তাপই না থাকল তবে তা আর তপ কিসে? কিন্তু আরম্ভে সংযম কিছুটা তাপদায়ক মনে হলেও সাধকের কাছে তা কখনও বোঝা মনে হয় না; স্ফূর্তিই সে পায়। পথিকের কাছে সন্দেশের পুটুলি কখনও বোঝা মনে হয় কি? সাধকের কাছে যদি সংযম বোঝা মনে না হয় তবে স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে তা বোঝা মনে হবে এ হতেই পারে না।

১২১. স্থিতপ্রজ্ঞের অসংযম অসম্ভব। কারণ স্থিরবুদ্ধির আধারই সংযম

অভ্যাস হয়ে গেলে সংযম স্থির বুদ্ধিরই অঙ্গ হয়ে যায়। সংযমেরই ওপর স্থির বুদ্ধি খাড়া। কাজেই স্থিরবুদ্ধি হওয়ার পরে মানুষ সংযমের বিষয়ে ঢিল দিবে এটা সম্ভব নয়। কাঠুরে অন্য সব ডাল কাটতে পারে কিন্তু যে ডালে সে দাঁড়ানো তা সে কাটবে কি করে? স্থির-বুদ্ধি সংযমের ওপর খাড়া বলে সংযমের ওপর কুড়ুল সে চালাতে পারে না। স্থির-বুদ্ধি যদি সংযমের ওপর আঘাত হানে ত সে আত্মহত্যাই করে বসবে। একথাই জ্ঞানদেব বলতে চান। তার অর্থ এই নয় যে স্থিত-প্রজ্ঞকে নিত্য প্রযত্নশীল থাকতে হবে। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে স্থিত-প্রজ্ঞ সংযমের বিষয়ে ঢিল দিতে পারে, সে স্থলে সে স্থিত-প্রজ্ঞতার ভিতই খুঁড়ে ফেলবে! আর তাই সে তা করতেই পারে না, এ হচ্ছে এই শ্লোকের গভীর অর্থ।

১২২. সাবধানতা-নিরপেক্ষ সহজাবস্থা মানুষের একপ্রকার আকাঙ্ক্ষা মাত্র। অতএব সাবধানতার সংকেত যে কোন অবস্থায় ঠিক

এক দিক হতে বলা যেতে পারে যে স্থিতপ্রজ্ঞের সাধনার অথবা সাবধানতার দরকার নাই। অন্য দিক হতে তেমনি বলা চলে, তার দরকার আছে। সাবধানতা স্থিত-প্রজ্ঞের সহজ ধর্ম এই কথা বলে আমরা এই দুই পরস্পরবিরোধী কথার সামঞ্জস্য করেছি। অন্য আর এক ভাবেও এই সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। সাবধানতা-নিরপেক্ষ সহজাবস্থা একদিক হতে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। অন্তত লাখো লোকের পক্ষে ত বটেই। এই দেহে স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ণ ব্যাখ্যা পর্যন্ত পৌছোনো অসাধ্য না হলেও বহু লোকের পক্ষে তা অসাধ্যপ্রায়। সাধকের স্থিতি যেমন-যেমন উন্নত হতে থাকবে স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যাখ্যাও তার কাছে তেমন-তেমন সূক্ষ্ম হতে থাকবে। আর তাই আমি স্থিত-প্রজ্ঞ হয়ে গেছি এরূপ মনে করার স্থিতি মানুষের কোন দিনই আসবে না। এই অবস্থাটা এক দিক থেকে ইষ্টেরও বটে। দেহ যতদিন থাকে ততদিন বিকাশের অবকাশ থাকা মঙ্গলের। কেবল তাই নয়, বিকাশের যে বাকী আছে দেহের অস্তিত্বই তার এক নিদর্শন—একথা বোঝা দরকার। টলস্টয়ের কথায় বললে সাধক ও তার ধ্যেয়ের মধ্যে এই যে নিরন্তর লুকোচুরি খেলা চলছে, মজা ত সেখানেই। সাধকের যেই মনে হতে থাকে এই ত লক্ষ্যকে 'ছুঁয়েছি রে ছুঁয়েছি' অমনি 'আমি পালিয়েছি রে পালিয়েছি' বলে ধ্যেয় আগে ছুটে পালায়। এখানেই ত সাধনার দিব্যত্ব। অতএব সাধককে যে কোন সময়ে ভয়ের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া ঠিকই বটে। 'তবে ত ধ্যেয় লাভ

কোনদিনই ঘটবে না' একথা যেন ধরে না নিই। ঈশ্বরের কৃপায় ধ্যেয় লাভ অবশ্যই হবে। কিন্তু লব্ধি হয়েছে, এখন আমি নিজের মনকে যেমন-ইচ্ছা ছেড়ে দিতে পারি, যে মুহূর্তে এভাব মানুষের হবে সে মুহূর্তেই তার লব্ধি উধাও হবে, তা সে খুইয়ে বসবে, একথা মনে রাখতে হবে। সাঁতারু অনেক সময় একেবারে নদীর কিনারায় পৌঁছে যায়, কিনারায় হাতও ঠেকায়, কিন্তু হাত ফসকে পুনরায় স্রোতে ভেসে যায়। হাত কিনারায় ঠেকালেই হল তা নয়। পা যখন কিনারার মাটিতে ঠেকবে তখন বলা যাবে পৌঁছোনো গিয়েছে। অতএব শেষ অবধি সংযমে ঢিল দিতে নাই এমনটা মনে করাই সাধকোপযোগী হবে।

তিন

১২৩. এভাবে সংযমের আবশ্যকতা আদ্যন্ত সপ্রমাণ হল, তাই নিগমন

এ প্রকারে সংযমের আবশ্যকতা আরম্ভ থেকে অন্ত পর্যন্ত সপ্রমাণ হল, অর্থাৎ পুরোপুরি সিদ্ধ হল। সংযমের আবশ্যকতা আদ্যন্ত সপ্রমাণ করার পরে এখন 'তস্মাৎ' শব্দ ব্যবহার করাতে বাধা নেই।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

তস্মাৎ শব্দ ব্যবহার করে মূল প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখ মাত্র এখানে করা হয়েছে। তর্কশাস্ত্রে একে 'নিগমন' বলে। আরম্ভে মূল সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা, তারপরে যুক্তির দ্বারা তার সমর্থন করা এবং অন্তে সেই প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখ করা এই হচ্ছে তর্ক-শাস্ত্রের পদ্ধতি। এরূপ করলে

শাস্ত্রের সমাধান হয়। এ হচ্ছে ইউক্লিডের ক্যু. ই. ডি। অর্থাৎ 'ইতি সিদ্ধম্'। গীতার পদ্ধতি অক্ষরশ তর্ক-শাস্ত্রের পদ্ধতি নয়। শাস্ত্রের কাঠামোতে চেপে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে খামকা হয়রান করাতে গীতার রুচি নেই। তাই ত সাধারণ লোকে অনায়াসে বোঝে এমনতর সহজ কথাবার্তাচ্ছলে গীতা আলোচনা করেছে, অথচ শাস্ত্রেরও উপেক্ষা করে নাই। আর সংযমের তাত্ত্বিক উৎপত্তি বিশেষভাবে আলোচনা করার ছিল বলে শাস্ত্রীয় শৈলীর আবশ্যকতাও এখানে ছিল। তাই শাস্ত্রের সন্তোষের জন্য আরও একটি শ্লোক খরচ করে ফেলেছে। 'যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ' এই শ্লোকে আগে যা বলা হয়েছে ঠিক তাই-ই এখানে আবার বলা হয়েছে। কেবল কচ্ছপের উপমার অংশটা বাদ দিয়ে সেই শ্লোকের ঠিক যেমনটি-তেমন পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে নিগমনের স্বরূপ।

ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান

এক

১২৪. অন্তিম বিভাগ : স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতির স্পষ্টীকরণ

স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণের দুই বিভাগ সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয় ও অন্তিম বিভাগ এবার দেখতে হবে। প্রথম চার শ্লোকের বিভাগে স্থিত-প্রজ্ঞের ব্যাখ্যা আর সেই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। মধ্য বিভাগে তদানুষঙ্গিক তিন শ্লোকে সংযমের বিজ্ঞান ও সাত শ্লোকে সংযমের তত্ত্বজ্ঞান খুলে দেখানো হয়েছে। এখন অন্তিম বিভাগে স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতির বিশ্লেষণ করে তার ফলশ্রুতি দেখাতে হবে। তিন শ্লোকের এক ত্রিসূত্রীতে স্থিতির স্পষ্ট রূপ দেখা যাবে আর অন্তিম শ্লোকে ফলশ্রুতি বলা হবে।

১২৫. সারাংশের প্রথম সাংকেতিক শ্লোক। এর রাত ও তার দিন আর তার রাত ও এর দিন

যা নিশা সর্ব-ভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

সারাংশের এ প্রথম শ্লোক। অক্ষরে অক্ষরে এর অর্থ এরূপ, 'যখন প্রাণিমাত্র ঘুমোয় স্থিত-প্রজ্ঞ তখন জেগে থাকে। আর যখন প্রাণিমাত্র জেগে থাকে তখন স্থিত-প্রজ্ঞ শান্তিতে নিদ্রামগ্ন।' কিন্তু এর অক্ষর-অর্থ নিলে হবে না, নিতে হবে লক্ষণ-অর্থ, একথা সুস্পষ্ট। অক্ষর-অর্থে এই শ্লোকে স্টেশন-মাস্টার, চোর, রাতে যাদের কাজের পালা এমন মজুর

ইত্যাদিকে বোঝাবে। গান্ধীজী এই শ্লোক থেকে অক্ষরার্থ দোহনের কিছুটা প্রযত্ন করেছেন। "সাধারণ লোকে বিলাসাদিতে রাত কাটায় আর ভোরে ঘুমোয়। কিন্তু সংযমী রাতে ঘুমোয় আর প্রভাতে উঠে মনন, চিন্তন আদি করে।" এরূপ উপযোগী অর্থ তিনি দোহন করেছেন। কিন্তু তিনিও এই শব্দার্থকে মুখ্য স্থান দেন নি। এই শ্লোকের সূক্ষ্ম ও লাক্ষণিক অর্থ যে করতে হবে সে বিষয়ে তিনি সজাগ। আর পরে নিজ পদ্ধতি অনুসারে তা তিনি করেছেনও।

১২৬. অর্থাৎ স্থিত-প্রজ্ঞের সমগ্র জীবন দৃষ্টিই অন্য সবার বিপরীত

এই শ্লোকে যে রূপক রয়েছে তাতে স্থিত-প্রজ্ঞের জীবন-দৃষ্টি বিন্যস্ত। স্থিত-প্রজ্ঞের জীবন-দৃষ্টি ও অজ্ঞজনের জীবন-দৃষ্টি এই দুইয়ে মস্ত ব্যবধান। দুই সমান্তর রেখার যেমন কোন স্পর্শ-বিন্দু নাই তদ্রূপই এই দুইয়ের জীবন-দৃষ্টির স্থিতি। স্থিত-প্রজ্ঞের দৃষ্টিই উল্টো। 'উল্ট ভঈ মোরে নয়ননকী' মীরাবাঈয়ের একথার মতই তার অবস্থা। বস্তুত তার দৃষ্টি উল্টো নয়, সোজা। জগতের দৃষ্টিই উল্টো। কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের তেমনটি বলে বিপরীতই রীত হয়ে গেছে। বহুসংখ্যার দোষই বা খামকা দেওয়া কেন ? তাই মীরাবাঈ নিজের দৃষ্টিকেই উল্টো ধরে নিয়েছিলেন। মূল জীবন-দৃষ্টি ঘুরে যায় ত জীবনের সকল ক্রিয়া তদনুসারী হয়।

১২৭. উদাহরণস্বরূপ খাওয়া

উদাহরণস্বরূপ, শরীর-ধারণের পক্ষে খাওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকে খায় আর স্থিত-প্রজ্ঞ উপোস করে তা নয়। স্থিত-প্রজ্ঞও খায়।

দুইয়ের বাহ্য ক্রিয়া সমান। কিন্তু বৃত্তি, বিচার ও ভাবনা একরূপ নয়। স্থিত-প্রজ্ঞের আহার যেন যজ্ঞ। কেবলমাত্র শরীর-ধারণের জন্য তটস্থ ভাবনা থেকে তা করা হয়। উপনিষদের ও শংকরাচার্যের ভাষায় তা হচ্ছে 'ঔষধরূপ', গান্ধীজীর ভাষায়, 'যে ঘরে বাস করি তার ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া', অথবা বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় বললে তা হবে, 'কল থেকে কাজ পেতে হলে তাতে তেল ত দিতেই হবে।' শরীর সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখার জন্য সে তাকে আহার দিয়ে থাকে। ভোগ-বৃত্তি তাতে নেই। অন্যের আহারে থাকে ভোগ, আনন্দ, আগ্রহ। তার জন্য অনেক বুদ্ধি, সময় ও শ্রম খরচ করা হয়। কত বিরাট আয়োজন ও ব্যবস্থাই না করতে হয়! মানব-সমাজের অর্ধভাগকে—স্ত্রীলোকদের ঐ কাজেই প্রায় ব্যস্ত-সমস্ত থাকতে হয়। এমনটাই মহা আড়ম্বরের ব্যাপার হয়ে গেছে আহার। স্থিত-প্রজ্ঞের আহার শাস্ত্রীয় বলে তার মূলে গভীর হেতু থাকে। অন্যের আহার ভোগময়, তমোময়।

১২৮. নিদ্রা সম্বন্ধেও ঐ কথা

নিদ্রার কথায়ও ঠিক তা-ই। শরীর-ধারণের পক্ষে আহার যেমন প্রাণীমাত্রের প্রয়োজন, নিদ্রাও তেমন প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ লোক ঘুমোয় ত আলস্যের শিকার বনে। স্বপ্ন দেখে। জ্ঞান খোয়ায়। এক রাত যায় না ত কিছু জ্ঞান ক্ষয় হয়। স্থিত-প্রজ্ঞের নিদ্রা নির্দোষ ও নিঃস্বপ্ন। একবারে যতটা ঘুমান ততটাই তাঁর বিচার-বিকাশ হয়। বীজ মাটিতে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু থাকে তা বস্তুত অঙ্কুরিত হতে। অঙ্কুর বেরোয় ত দেখা যায়। তদ্রূপ তাঁর নিদ্রাতে নূতন নূতন বিচার পুষ্ট হতে থাকে। এরূপে দুইয়ের নিদ্রায় ব্যবধান আছে। একের ঘুমে হয় তমোগুণের বৃদ্ধি। কোথায় এই নিদ্রা আর কোথায় সেই নিদ্রা

যাতে তিন গুণ সাম্যাবস্থায় পৌঁছে, মূল প্রকৃতিতে স্থিত হয়? দেখতে দুইয়েরই রূপ এক। তা হলে কি হয়?

১২৯. সাধারণ ব্যবহারেও তদ্রূপ

সাধারণ ব্যবহারের কথায়ও তাই। মানাপমানের কল্পনার ওপরই মানুষের অনেক সমাজশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র রচিত। স্থিতপ্রজ্ঞের মানাপমানের বোধ নাই। প্রায় কখনও মানুষ সহজভাবে, খোলাখুলি ব্যবহার করে না। শিষ্টাচারের নামে সবক্ষণ তাকে নিজের আচরণ কপটাচারের আবরণে ঢাকতে হয়। পদে-পদে কৃত্রিমতা বা কপটাচার। সভায় এক রকমের ভান, সমাজে আর এক রকমের, পরিবারে তৃতীয় এক রকমের, উৎসবে তা ভিন্ন আর এক রকমের, খেলায় অন্য আর এক ভান। এভাবে জীবনের সর্বত্র কপটাচার ও পোশাকীপনা। স্থিত-প্রজ্ঞের সবই স্বাভাবিক, সবই সোজা, সবই খোলামেলা। এভাবে তাঁর সাধারণ ব্যবহার পর্যন্ত অন্য লোকের থেকে একেবারে স্পষ্টভাবে উল্টো দেখা যাবে।

দুই

১৩০. এখানে রূপকের ভাষায় সাংখ্যবুদ্ধি, যোগবুদ্ধি ও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ তিনকেই একসূত্রে গাঁথা হয়েছে

কিন্তু গীতার রূপকের ভাষা থেকে এভাবে আমরা নিজের বিচার দ্বারা অর্থ বের করলাম বটে, তবুও স্বয়ং গীতা কি বলে? দেখতে মনে হয় কিছুই যেন বলে না: সেরেফ রূপকের ভাষা বলেই যেন নিরস্ত থাকে।

কিন্তু বস্তুত তা নয়। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের পরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, আর সূত্রাকারে গীতাই সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আরম্ভ থেকে যে বিষয় সবিস্তারে বলা হয়েছে, সে সকলের সমাবেশ এই শ্লো'ক করা হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে। এই পর্যন্ত, প্রথমে নির্গুণ সাংখ্যবুদ্ধি, তারপর তদুপকারক সগুণ যোগবুদ্ধি ও অন্তে এই দুইয়ের পরিণতি যার মধ্যে দেখা যায় সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ—এই তিন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এই তিন বিষয়ের সার এই শ্লোকে রূপক দ্বারা উপস্থিত করা হয়েছে।

১৩১. সাংখ্যবুদ্ধির স্বরূপ: আত্মার অকর্তাভাব। তদনুসারে আলোচ্য শ্লোকের প্রথম অর্থ

(১) সাংখ্য-বুদ্ধি মানে আত্মার স্বরূপের জ্ঞান। এই জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য আরম্ভেই এই হুটোপাটি কেন? উত্তর—"আত্মার জ্ঞান মানে অজানা জ্ঞান নয় বলে।" আত্মা কিছু অপরিচিত নয়। সে ত আমিই। তাই তার স্বরূপ কি তা সকলের আগে জেনে নেওয়া আবশ্যক। গীতা বলে, 'আত্মা মরে না, মারে না, মারায় না।' মানুষের ক্রিয়া তিন প্রকারে ঘটে। কর্তরি, কর্মণি ও হেতু-কর্তরি কিংবা প্রেরক। আত্মা এই তিনের ধার ধারে না। ক্রিয়ার না সে কর্তা, না কর্ম, না প্রেরক। এতটা ব্যাপক অর্থ এখানে সূচিত হয়েছে। 'মরণ' ক্রিয়া ত উদাহরণস্বরূপ নেওয়া হয়েছে। তার অর্থ এই যে—আত্মা সর্ব ক্রিয়া দ্বারা সর্ব প্রকারে অস্পৃষ্ট। শাঙ্কর ভাষ্যে আত্মার এই অকর্তৃত্ব আয়নার মত স্বচ্ছ করে ধরা হয়েছে। আত্মার অকর্তৃ-স্বরূপের জ্ঞানকে আলো বলা যায়। এর উল্টো, আত্মাকে কর্তা মনে করা হচ্ছে অন্ধকার। এই অন্ধকারে সকল প্রাণীর জীবন ঘিরেছে। কিন্তু স্থিত-প্রজ্ঞের জীবন

আত্মার প্রকাশে নিত্য উজ্জ্বল। এই হচ্ছে উল্লিখিত শ্লোকের প্রথম অর্থ। আমি অমুক কর্ম করেছি, আমার কাজ ভাল, আমি অমুকের ছেলে, অমুক সম্পত্তির আমি মালিক, এই আমার আকার, এই আমার বয়স, আমি অমুক জাতের ইত্যাদি ভাবনার জাল বুনে মানুষ নিজের উপর অগণিত কর্মের বোঝা চাপায়। উল্টো, এর কোন কিছু আমার নয় একথা জেনে স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপাবস্থানকে একমাত্র ধর্ম জ্ঞান করে। দুইয়ের জীবনে এই ব্যবধান। তাই তাদের আলো ও অন্ধকার বলব না ত বলব কি ?

১৩২. যোগবুদ্ধির স্বরূপ : ফলত্যাগ

(২) যোগ-বুদ্ধি—আত্মা অকর্তা একথা মনে করে দৈহিক কর্ম ছেড়ে দাও ত তমোগুণের খপ্পরে গিয়ে পড়বে ; উল্টো, কর্ম কর ত রজোগুণের প্যাঁচে পড়বে—এভাবে দুইটিই ফাঁদ। তাই গীতা উপায় বের করেছে। কর্তৃত্ব যেখানে জোর ধরে সেখানেই তাকে চূর্ণ করে দাও। কোথায় কর্তৃত্ব কোমর বাঁধে ? ফলের বিষয়ে। "কাজ করেছি অতএব বেতনে আমার অধিকার আছে।" এরূপ কর্তৃত্বের দাবি ফলের বিষয়ে মাথা চাড়া দেয়। তাই ফলের অধিকার ত্যাগ করার অর্থই কর্তৃত্বপনা ত্যাগ করা। ফলের আশা বৃন্তেই শেষ করে দাও ত কর্তৃত্বের অভিমানও শেষ হয়ে যাবে। গীতা বলে, "আত্মার অকর্তৃত্ব তুই মেনে নিয়েছিস। অতএব যে অর্থে কর্মই তোর নয় সে অর্থে ফলও তোর নয়। তবে তা আর আসবে কোথা থেকে ?" 'আমি দেহ হতে আলাদা—অকর্তা', কর্ম ছেড়ে দিয়ে এই অভ্যাস হবার নয়। ফল ছাড়লেই তা হবে। আত্মার অকর্তৃত্বের অনুভূতির আরম্ভ

কর্মচ্ছেদে নয়, ফলেচ্ছার ছেদনে। এরূপে একেবারে 'বালোত্থান'-পদ্ধতিতে অকর্তৃত্বের অভ্যাসের পদার্থপাঠ গীতা দিয়েছে। ফল ফেলে দেওয়ার কথায় কর্মচ্ছেদ করার তাগিদ নাই। সমাজশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অনুসারে ফলে তোর অধিকার আছে। কিন্তু তুই না গীতার অনুযায়ী! সেই মায়ের ছেলে হওয়ার ভাগ্য তোর হয়েছে। তাই তার ছেলের যোগ্য ফলত্যাগের এমন ঐশ্বর্য তোতে বর্তেছে।

১৩৩. আনুষঙ্গিক চর্চা—'মা ফলেষু' মানে ফলে অধিকার নাই, একথা ঠিক নয়

যে বাক্যে গীতা ফলত্যাগের পথ দেখিয়েছে সেই প্রসিদ্ধ বাক্য এই : "কর্মণ্যেবাধিকারস্ তে মা ফলেষু কদাচন"। এই বাক্যের অর্থ ক্বচিৎ ঠিক ঠিক করা হয়। কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়—এরূপ অর্থ এই বাক্যের করা হয়। কিন্তু কর্মে অধিকার আছে ত ফলে নেই কেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে ফল কেবল মানুষের হাতে নয়। নানাবিধ বাহ্য অবস্থার দ্বারা তা নিয়মিত। এ ত দৈববাদ হল। তার মূলে আদবে তথ্য নেই তা নয়। কিন্তু তাতেই এই তর্ক সিদ্ধ হল তাও নয়। কারণ যদি এবং যে কারণে ফল মানুষের হাতে নয়, তবে আর সেই কারণেই কর্মও মানুষের হাতে নয়। উভয়ই বাহ্যস্থিতির ওপর অল্পাধিক নির্ভরশীল। ফল-বিষয়ক স্থিতি যা কর্ম-বিষয়ক স্থিতিও তা-ই। কর্মের বিষয়ে অধিকার আছে ত ফলের বিষয়েও আছে। পুরোপুরি না হোক, আংশিকই হোক, কিন্তু আছে। ফলের বেলায় অধিকার নেই ত কর্মের বেলায়ও নেই। সেজন্য এই অর্থ ঠিক নয়।

১৩৪. ফলে অধিকার ত আছেই কিন্তু তা ছাড়া চাই

তা হলে ঐ বাক্যের অর্থ কি ? তার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের আশ্রয় একটু নিতে হবে। এখানে 'মা ফলেষু' বলা হয়েছে, 'ন ফলেষু' বলা হয়নি। ব্যাকরণমতে 'মা'-র পরে অস্তি কিংবা ভবতি এরূপ বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ আসে না। 'অস্তু' কিংবা 'ভবতু' এরূপ ক্রিয়াপদ বসে। তদনুসারে পুরো বাক্যটি এরূপ দাঁড়াবে : "কর্মণি এব তে অধিকারঃ অস্তু, ফলেষু মা অস্তু"। এই হচ্ছে তার অর্থ, "কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।" এরূপ অর্থশোধন না হয় ব্যাকরণ অনুসারে করলাম কিন্তু দাঁড়াচ্ছে কি ? দাঁড়াচ্ছে এই যে, "কর্মে তোমার অধিকার আছে আর তাই ফলেও আছে। "কিন্তু কর্ম পুরোটাই রাখো, আর ফল পুরোটাই ছাড়ো।" তা কেন ? ভাল, তোমার গীতা বলে, তোমার তত্ত্বজ্ঞানও বলে যে আমি কর্তা নই। নিজ অকর্তৃত্ব অনুভব করতে হয় ত ফল নিও না।

১৩৫. নীতি-শাস্ত্রের ভূমিকা : কর্ম যার ফল তার

(১) এই বিষয়ে স্থিত-প্রজ্ঞের ভূমিকায় ও অন্য সবের ভূমিকায় ব্যবধান খুব বেশী। 'করব ত ফলের জন্য করব, নয়ত কর্মই ছাড়ব ; নেব ত ফলসমেত নেব, ছাড়ব ত কর্মসমেত ছাড়ব'—এ হচ্ছে লোকের ভূমিকা (ভাব)। এখানেই দাঁড়ি পড়ত ত কথা ছিল না। কিন্তু অনেকে ত আর এক পা এগিয়ে যেতে চায়—'কর্ম না করেই ফল মেলে ত আরও ভাল। যদি না মেলে আর কর্ম না করলেই নয় ত কর্ম করব ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই ফল কখনো ছাড়ব না।' এই হীন বৃত্তির দরুন আজ দুনিয়াভর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। নিজে না খেটে অন্যের খাটুনির ফল

ভোগ করব, দুইচারজন মন্দ লোকই কেবল এই ফিকিরে আছে তা নয়, রাষ্ট্র-কে-রাষ্ট্র এই ফিকির-ফন্দি করছে। নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এরূপ অনেক মুফৎ-খাব-বাদ এই হীনবৃত্তির সমর্থনের জন্য সংগঠিত হয়েছে। আজই কেবল এরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা নয়। এখন তার বাড়াবাড়ি হয়েছে। প্রাচীনকাল হতে আজ অবধি তা প্রায় অখণ্ড চলে এসেছে। তাই এই হীন বৃত্তির নিরসনের জন্য একে আসুরী বৃত্তি নাম দিয়ে গীতা সমগ্র ষোড়শ অধ্যায় খরচ করেছে। একে খাটবে আর অন্যে তার ফল লুটবে সমাজ এই অবস্থায় এসেছে বলে, 'কর্ম যার ফল তার' এতটাতেও যদি রক্ষা হয় ত গঙ্গাস্নান—এই হচ্ছে নীতিশাস্ত্রের ও সমাজশাস্ত্রের ভূমিকা। তাই ত যোগ্য ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ফল লাভ করুক সে বিষয়ে সমাজশাস্ত্রের ও নীতিশাস্ত্রের এমন আগ্রহ। আর সমাজের প্রচলিত বৃত্তির ও এই দুই শাস্ত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের দিক থেকে দেখা যায় ত তাদের এই ভূমিকা ঠিকও বটে।

১৩৬. যোগবুদ্ধির ভূমিকা এর চাইতে উঁচু। সে অনুসারে এই শ্লোকের আর এক অর্থ

(২) কিন্তু গীতার ভূমিকা এর চাইতে উঁচু। তা বলে তা যদি কারো কাছে অকেজো মনে হয় ত হোক, কিন্তু তা যথাযথ বুঝে নেওয়া দরকার। গীতা বলে, "কর্তৃত্বের অভিমান থেকে মুক্ত হতে চাও ত নিজ থেকে ফল ঝেড়ে ফেলে দাও, ঈশ্বরে অর্পণ কর, সমাজকে দিয়ে দাও, মন চায় ত শূন্যে মিলিয়ে দাও, কিন্তু নিজে নিও না। অন্য কেউ বলছে বলে নয়, তোমার তত্ত্বজ্ঞানই সে বিষয়ে তোমার বাধা। তোমার তত্ত্বজ্ঞান বলে, কোন ক্রিয়াই আত্মাকে স্পর্শ করে না। ফলত্যাগ করাই

আত্মায় ক্রিয়ার স্পর্শ না হতে দেওয়ার উপায়।" এই তত্ত্বজ্ঞানই গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের বনিয়াদ। অনেকের মতে খামকাই গীতার একেবারে শুরুতে এই তত্ত্বজ্ঞানের বিচার উপস্থিত করা হয়েছে। প্রথমে কর্মযোগের কথা বলা উচিত ছিল। এরূপ মনে করা ভুল। গীতার কর্মযোগ আত্মজ্ঞানেরই ওপর দাঁড়াতে পারে। তা কেবল কর্ম করতে বলে তা নয়। ফল ত্যাগ করতেও বলে। আত্মজ্ঞানের ভাগটা বাদ দিলে ফলত্যাগের তত্ত্ব টিকতে পারে না। কেবল কর্মত্যাগ সম্ভব নয়। কারণ আমি আত্ম-স্বরূপ হলেও আজকার স্থিতিতে দেহ-প্রাচীরে আবদ্ধ। ওদিকে আবার ফলযুক্ত কর্ম খাপ খায় না। কারণ, 'আমি অকর্তা' এই ভাবনা দৃঢ়। দেহ যতক্ষণ আছে কর্ম থেকে ছুটি নেই। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের কারণে ফলযুক্ত কর্ম মানায় না। এভাবে কোন দিকেই এগোনো যায় না বলে গীতা ফলত্যাগপূর্বক কর্মযোগের পথ বের করেছে। চান ত একে 'মুরারেস্ তৃতীয়ঃ পন্থাঃ' বলতে পারেন, কিন্তু ইউক্লিডের প্রমেয় হতে যেমন উপপ্রমেয় বের হয় ঠিক তেমনি তর্কশুদ্ধ রীতিতে আত্মার অকর্তৃত্ব হতে ফলত্যাগের সিদ্ধান্ত বের হয়। এভাবে কর্মযোগের দৃষ্টিতে 'যা নিশা সর্ব-ভূতানাম্' শ্লোকটিকে দেখা যেতে পারে। তেমনটা দেখলে 'সাধারণ লোকে ফল-সম্বন্ধে জেগে থাকে ও কর্তব্য বিষয়ে ঘুমিয়ে থাকে আর স্থিতপ্রজ্ঞ কেবল ফল-বিষয়েই ঘুমিয়ে থাকে ও কর্তব্য বিষয়ে জেগে থাকে', এই শ্লোকের এরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এটাই এই শ্লোকের আর এক অভিপ্রেত অর্থ।

১৩৭. স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ অনুসারে এই শ্লোকের তৃতীয় অর্থ

(৩) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ অনুসারে তৃতীয় এক অর্থও হয়। বস্তুত তিন অর্থই মূলে সমান ও একই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার কারণ ভিন্ন

ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়-নিরোধকে স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে ভোগ-বাদে বুদ্ধি নাশ হয় আর বুদ্ধি স্থির হওয়ার পক্ষে সংযম দরকার। তদনুসারে স্থিত-প্রজ্ঞ ভোগের বিষয়ে সুপ্ত আর সংযমের বিষয়ে জাগ্রত এবং সাধারণ মানুষ সংযমের ব্যাপারে সুপ্ত আর ভোগের বিষয়ে জাগ্রত এখানে এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে।

১৩৮. তিন অর্থের দিকেই গীতার শ্লোকের ইঙ্গিত

এভাবে এই তিন অর্থ গীতার রূপক দ্বারা সূচিত করা হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে। এই সূচনার কোন প্রমাণ বা ইঙ্গিত এই শ্লোকে আছে কিনা একথা বিচার করতে গেলে ‘পশ্যন্’, ‘মুনি’ ও ‘সংযমী’ এই তিন শব্দের ওপর দৃষ্টি পড়ে। ‘পশ্যন্’ শব্দ থেকে সাংখ্যবুদ্ধি-নিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী, ‘মুনি’ শব্দ থেকে যোগবুদ্ধি-নিষ্ঠ কর্ম-যোগী এবং ‘সংযমী’ শব্দ হতে উভয়-বুদ্ধি-নিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ—যার প্রসঙ্গ এখানে চলছে—এরূপ অর্থ ক্রমশ পাওয়া যাচ্ছে। আর এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে এই তিন অর্থ এখানে বিশেষ ভাবে দেখানোর ছিল। কিন্তু এই রূপকের সাধারণ অর্থ এই যে স্থিত-প্রজ্ঞের ও সাধারণ লোকের জীবন-দৃষ্টি একেবারেই ভিন্ন। তাই বিশিষ্ট তিন অর্থ পৃথক পৃথক না নিয়ে সব মিলিয়ে সর্ব জীবন-ব্যাপী অর্থও নেওয়া যাবে। আর ঠিক আরম্ভে আমরা তা-ই করেছি। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এই তিন বিশেষ অর্থও জীবন-ব্যাপক।

চতুর্দশ ব্যাখ্যান

এক

১৩৯. বিশ্লেষণকারী আর একটি সাংকেতিক শ্লোক। জ্ঞানী সমুদ্রের ন্যায় সকল কাম হজম করে ফেলে

আজকার শ্লোকে স্থিত-প্রজ্ঞের বর্ণনা অন্য আর এক ভাবে করা হয়েছে। শ্লোকটা প্রথমে বুঝে নিতে হয়। "আপূর্যমাণং অচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রং যদ্‌বত্‌ আপঃ প্রবিশন্তি তদ্-বত্‌ সর্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিং আপ্নোতি" এটি এক বাক্য। "ন কাম-কামী" হচ্ছে অপর বাক্য। 'আপূর্যমাণম্‌'-এর অর্থ সব দিক থেকে সব সময় ভরছে এমন। তা সত্ত্বেও যা নিজের সীমা লঙ্ঘন করে না, নিজ প্রতিষ্ঠা (স্থান) থেকে নড়ে না, 'আপূর্যমাণং অপি, অচল-প্রতিষ্ঠম্‌' এরূপে 'অপি' শব্দের অধ্যাহার করতে হবে। 'সমুদ্র যেমন সব দিক থেকে বয়ে-আসা সব জল নিজের মধ্যে নিয়ে নেয় অথচ নিজের সীমা অতিক্রম করে না, স্থিতপ্রজ্ঞ তেমন নানাদিক থেকে নানা কাম ভিতরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও বিচলিত হয় না। তাই সে শান্তি পায়। কামের পিছনে যারা দৌড়োয় তারা তা পায় না' এটাই এই শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ। শ্লোকটি বড়ই সুরচিত কিন্তু বোঝার পক্ষে একটু কঠিন।

১৪০. কাম-শব্দের অর্থের বিচার-বিশ্লেষণ।

এখানে প্রথমেই কামশব্দের অর্থ বিচার করে দেখা দরকার। এই কামশব্দ স্থিত-প্রজ্ঞ লক্ষণে এক জায়গায় একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার অন্যত্র হয়েছে বহুবচনে। 'সংগাত্ সঞ্জায়তে কামঃ' এখানে কাম শব্দ একবচন। এই কামের অর্থ মূল বিকার। এই মূল কামনা হতে অবান্তর কামনাসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই একবচনান্ত কাম শব্দের বিভাসা (ভাষান্তর করার উপযোগী অন্য শব্দ) মারাঠী তথা বাংলা ভাষায় নাই। সুতরাং ঐ শব্দ দ্বারাই তার কাজ চালাতে হবে। বহুবচনান্ত কাম শব্দের ব্যবহার একেবারে আরম্ভে 'প্রজহাতি যদা কামান্'-এ এবং শেষে 'বিহায় কামান্ যঃ সর্বান'-এ একই প্রকারে হয়েছে। এই দুই জায়গায়ই তার অর্থ কামনা বুঝতে হবে। এই সব কামনা মনোগত বলে ত্যাগ করা যেতে পারে, ইষ্টেরও বটে। তা অবশ্য করা দরকার। স্থিত-প্রজ্ঞ তদ্রূপই তা ত্যাগ করেছে, একথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া এই শ্লোকেই 'কাম' শব্দ আর এক অর্থে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কামাঃ যং প্রবিশন্তি' এখানে কাম-এর অর্থ মনোগত কামনা নয়। 'কাম্যন্তে ইতি কামাঃ' যদ্‌বিষয়ক কামনা করা যায় তা কাম, এই ব্যুৎপত্তি মূলে তার অর্থ এখানে হয় বাহ্য বিষয়, উপভোগ্য পদার্থ, বিষয়-ভোগ। এই অর্থে 'কাম' শব্দ উপনিষদেও পাওয়া যায়। 'যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্য-লোকে' অর্থাৎ যে যে বিষয়-ভোগ এ জগতে দুর্লভ তার সবই তোমায় দিচ্ছি, যম নচিকেতাকে এরূপ প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। এই বাক্যে কাম শব্দের অর্থ 'বাহ্য উপভোগ-বিষয়'। আলোচ্য বাক্যটিতে ঠিক এই অর্থ রয়েছে। সব মিলিয়ে এভাবে কাম শব্দের তিন মুখ্য অর্থ পাওয়া যাচ্ছে : মূল বিকার 'কাম', মনোগত 'কামনা' এবং তদাধারভূত বাহ্য বিষয়ের 'ভোগ'। বাহ্য বিষয়কে কামনার আধার বলার হেতু এই যে এই সবকে আশ্রয় করে মনে কামনা জাগ্রত হয়। এইসব বিষয়ই মনে কামনা উৎপন্ন হওয়ার হেতু হয়, তা নয়। তারা হয় কামনার নিমিত্ত। অনেকানেক জন্মের পূর্ব-কর্ম,

নানা পুরাতন ও নূতন অনুভব এবং তা থেকে উৎপন্ন সংস্কার, এই সব মনের কামনার মূল কারণ। তার ফলেই ঐ সব বাহ্য পদার্থের উপভোগ্যত্বের কিংবা বিষয়ত্বের উদ্ভব হয়ে থাকে।

১৪১. স্থিতপ্রজ্ঞ সর্ব কাম হজম করে ফেলে—এটা তার জ্ঞানের গরিমা

সব দিক হতে জল যেমন সতত সমুদ্রে এসে পড়ে তেমন বিশ্বের অনন্ত বিষয় স্থিত-প্রজ্ঞে এসে সতত প্রবেশ করে। চোখের সামনে চোখের বিষয় খাড়া, কানের কাছে কানের বিষয়। কিন্তু সমুদ্র যেমন সকল জল নিজ স্বরূপেতে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে নেয়, স্থিত-প্রজ্ঞ তদ্রূপ সকল বিষয়-ভোগকে নিজ স্বরূপে জীর্ণ করে ফেলে। চোখ যে রূপ দেখে, কান যে শব্দ শোনে তথা অন্য ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ বিষয়ের যে অনুভব প্রাপ্ত হয় সেই সবকে সে আত্মস্বরূপে পরিপাক করে নেয়; মনের ওপর তার কোন ছাপ পড়তে দেয় না। বাহ্য বিষয়ের প্রভাব অনুকূল ও প্রতিকূল বেদন-রূপে মনের ওপর পড়ে। একে মনের ধর্ম, বিষয়ের ধর্ম অথবা মন ও বিষয়ের মিলিত ধর্ম যাই বলুন, আসল কথা এই যে বাহ্য বিষয় নাশ করে ফেলা সম্ভব নয়। সংযমসাধনের জন্য সকল বাহ্য বিষয় নষ্ট করে ফেলার নিশ্চয় যদি করি ত সমস্ত জগতের লয় আমাদের করতে হবে। তা সম্ভব নয়। তার দরকারও নেই। বাইরের বিষয় ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে থাকলেও স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্তে তাদের ছাপ পড়ে না। তার স্থিতি অবিচল থাকে। এভাবে এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বৈভব বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্য বিষয়ের ত্যাগ নয়, করতে হয় ত হৃদয়ের বিবিধ কামনার নাশ। তা সে কবেই করে রেখেছে। কোন বিষয় থেকে তার দূরে থাকার দরকার নাই। সর্ব বিষয়ের বাজারে নিয়ে

তাকে বসিয়ে দিন তবুও নিজ স্থিতি থেকে সে টলবে না। এ কথার ওপর নীতি-শাস্ত্র প্রশ্ন তুলবে, তবে কি তার গ্রাহ্যাগ্রাহ্যবিবেক কিংবা নীতি-বিচার নষ্ট হয়ে গেছে? তার উত্তর হচ্ছে, কোন বিষয় নিতে হবে আর কোন বিষয় ছাড়তে হবে সেই নীতি-সূত্রের নির্দেশ করা এই শ্লোকের কাজ নয়। এতে জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। জ্ঞানী পুরুষের গৌরব গীত হয়েছে।

দুই

১৪২. জ্ঞানের গৌরব ও জ্ঞানের স্বরূপ এই দুইয়ের মাঝখানে তার নীতিসূত্র রয়েছে

স্থিতপ্রজ্ঞের অবিচল স্থিতির বর্ণনা দুই ভাবে করা যায়। এক দিকে তার কাছে একান্ত পরিশুদ্ধ কর্মও অসম্ভব এবং আর এক দিকে নিষিদ্ধ কর্মও সম্ভব, এক দিকে শুভাশুভ সব কর্মের সন্ন্যাস, অন্য দিকে শুভাশুভ সর্ব কর্মের যোগ—এভাবে দুই অন্তিমের বর্ণনার দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা বর্ণনা করা যাবে। এক দিকে একথা বলা যাবে যে জ্ঞানী কিছুই করে না। হাত পর্যন্ত নাড়ে না। ভাল কর্ম পর্যন্ত করে না। অন্য দিকে একথাও বলা যায় যে সে ত্রিভুবন জ্বালিয়ে দিতে পারে। তবু এই দুই কথায় বিরোধ নাই। এখানেই তার ভূমিকার মাধুর্য। ভাষ্যকারদের পরস্পর-বিরোধী বিচার-বিশ্লেষণে এই মাধুর্যের দর্শন মেলে। শঙ্করাচার্য প্রসিদ্ধ মুক্তিবাদী আর তাই সর্বকর্ম-সন্ন্যাসবাদী। তিনি বলেন জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম করা সম্ভবই নয়। কিন্তু তিনিই নিজ ভাষ্যে এরূপ বলেছেন, "জ্ঞানী সকল কর্ম—নিষিদ্ধ কর্ম পর্যন্ত করে অকর্তা থাকে।" "সর্ব-কর্মাণ্যপি, নিষিদ্ধান্যপি, কুর্বাণঃ।" নীতি-শাস্ত্র তর্কস্থলে যদি ভাষ্যকারকে জিজ্ঞাসা

করে সত্যসত্যই কি জ্ঞানী নিষিদ্ধ কর্ম করবে? ত উত্তরে তিনি বলবেন, এখানে আমি নীতি-অনীতির কথা বলছি না, করছি জ্ঞানের মহত্ত্ব বর্ণনা। জ্ঞানী কি করবে একথা জিজ্ঞাসা করেন ত আমার মতে সে শুদ্ধ বা ভাল কর্ম পর্যন্ত করবে না। কিছুই সে করবে না। নড়ন-চড়ন পর্যন্ত তার নাই। কিন্তু একথার ওপর নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন হবে, আপনি ত আর এক অন্তিমে চলে গেলেন! তার উত্তরে ভাষ্যকার বলবেন, "বাবা, এখানে আমি জ্ঞানের নীতি-সূত্র বলি নি। করেছি জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা।" অর্থাৎ একদিকে দেখিয়েছি জ্ঞানের গৌরব অন্যদিকে জ্ঞানের স্বরূপ। স্থিতপ্রজ্ঞের জ্ঞানের স্বরূপ এই যে সে কোন কর্মই করে না। তার জ্ঞানের গৌরব এই যে নিষিদ্ধ কর্মও তার কাছে অপাচ্য নয়। স্থিতপ্রজ্ঞের নীতি-সূত্র তার জ্ঞানের স্বরূপ ও তার জ্ঞানের গৌরবের মাঝখানে অবস্থিত।

১৪৩. মধ্যখানে মানে কি? তা তৎতৎকালের সমাজের স্থিতির ওপর নির্ভর করবে

মধ্যখানে মানে কি? এর ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া একটু কঠিন। সমাজের ভূমিকা (স্থিতি) যত উচ্চ হতে থাকবে সমাজের জ্ঞানী পুরুষদের বিচারও তেমন গভীর হতে থাকবে। সমগ্র সমাজের অনুভব যেমন যেমন বাড়তে থাকবে স্থিতপ্রজ্ঞের প্রজ্ঞাও তেমন তেমন অধিক স্পষ্ট হতে থাকবে। অর্থাৎ অনাসক্তির মধ্যে অক্ষরশ ও ব্যবহারের ভাষায়—কোন কোন কর্ম পরিপাক হবে সেই মান উত্তরোত্তর বদলাতে থাকবে। পূর্বাপেক্ষা আজ যদি সমাজের প্রগতি হয়ে থাকে তবে পূর্বের স্থিতপ্রজ্ঞের অপেক্ষা আজকার স্থিতপ্রজ্ঞ অধিক প্রগত হয়ে থাকবে। একে মহা স্পর্ধার কথা মনে হবে। কিন্তু কথাটা যে ঠিক ভেবে দেখলে

তা বোঝা যাবে। স্থিতপ্রজ্ঞের এই প্রগতির কথা স্থূল অর্থে গ্রহণ করতে হবে। তার মানে তা ব্যবহারিক, আন্তরিক নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ মাত্রেরই ভিতরকার চিহ্ন একই থাকবে। তার আত্মস্থিতি কখনও ভঙ্গ হওয়ার নয়, সদা অবিচলিত থাকবে। এই হচ্ছে সেই চিহ্ন। এই চিহ্ন না টলে, না বদলে এরূপ ভাবে কর্মের আচরণই হবে তার নীতিসূত্র। নিজ অনুভূতি হতেই তা সে বুঝতে পারবে। সকলে বুঝবে এরূপ নিশ্চিত কথায় সর্ব কালের জন্য তা ব্যক্ত করার উপায় নাই।

১৪৪. জ্ঞানীদের নীতি-সূত্র সম্বন্ধে গ্রান্থিক কল্পনা হানিকর

অনুভবের আধার ছেড়ে কল্পনার আশ্রয় নিলে জিনিস স্পষ্ট না হয়ে হয় ঘোলা, তার প্রমাণ মেলে ভক্তিমার্গী ও কর্মযোগ-বাদীদের আলোচনা থেকে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যভিচারী একথা মেনে নিতে পর্যন্ত ভক্তিমার্গীদের বাধে নাই। অর্থাৎ তাঁকে যে তারা অলিপ্ত মনে করে সেটা শ্রীকৃষ্ণের ওপর তাদের কৃপা। শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্তিতে তাঁর তথাকথিত ব্যভিচার পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল একথা স্বীকার করে তারা নিজেদের ভক্তিভাবনার উৎকটতা প্রকাশ করেছে, এরূপ বলতে হয় ত বলুন। কোন কর্মযোগী ঠিক তেমনি প্রতিপাদন করতে পারে যে 'সর্বভূতে ভগবদ্‌ভাব'—রসে সিক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ অতি মারাত্মক হিংসাত্মক যুদ্ধও করতে পারে। স্থিতপ্রজ্ঞের নীতিসূত্র প্রকট করার বদলে তারা নিজেদের কল্পনার বৈভব প্রকট করছে। একের আধার ভাগবত আর একের মহাভারত। প্রমাণ ছাড়া কেউ-ই কথা বলছে না। কিন্তু প্রমাণ বা আধার ত হওয়া চাই আজকার সমাজের আজকার এই সময়ের যা প্রত্যক্ষ স্বানুভব তা। এই অনুভব-দৃষ্টে যা বলা হবে তাকেই যথার্থ বলা যাবে। কিন্তু একথা কেবল নিকট বর্তমান সম্পর্কে খাটে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তা বলা চলে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের আন্তরিক লক্ষণ যেমন তিন কালেই এক (তা আমরা দেখেছি) তদ্রূপ তার ত্রৈকালিক নীতিসূত্রের কথা যদি বলতে হয় ত তা "যা নিশা সর্ব-ভূতানাম্" এই শ্লোক দ্বারা বলা যাবে। অর্থাৎ বিবেকই তার নীতি-সূত্র।

তিন

১৪৫. এই শ্লোককে দেখার আর এক দৃষ্টি। ভাবাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞ সব শুভ দেখে

এই শ্লোকের অর্থের বিষয়ে অনেকের মনে আছে ভীতি আর অনেকের আছে বিশেষ প্রীতি। নীতি-নিষ্ঠদের ভয় এই যে এই শ্লোকে এক বিচিত্র নীতিসূত্র উপস্থিত করা হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ যদি তদনুসারে চলে ত নীতি বলে কিছু থাকবে না। এই শ্লোকে অনেকের প্রীতি এই কারণে যে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় একবার পৌঁছে গেলে সমুদ্রের মত সব কিছু আত্মসাৎ করা যাবে, আচরণে অবাধ-নিরঙ্কুশ হওয়া যাবে। বস্তুত ভীতি ও প্রীতি এই দুইয়ের কোনটির কথাই এখানে ওঠে না। কারণ একটু আগে আমরা দেখেছি যে স্থিতপ্রজ্ঞতে সকল বিষয় প্রবিষ্ট হতে থাকলেও সে নির্বিকার থাকে, এই কথা বলে স্থিতপ্রজ্ঞের নীতিসূত্রের ইঙ্গিত করা হয় নাই, দেখানো হয়েছে স্থিত-প্রজ্ঞের আত্মস্থিতির গৌরব। কিন্তু এ ছাড়া আর এক দৃষ্টিতেও এই শ্লোককে দেখা যেতে পারে। আর তেমনটা দেখাই এই শ্লোকের বিশেষ অভিপ্রেত। ঠিক বটে যে এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের নীতিসূত্র নয়, দেখানো হয়েছে তার গৌরব, কিন্তু তার চাইতে এখানে মুখ্যত বর্ণনা করা হয়েছে তার ভাব-দৃষ্টি, একথা মনে রাখতে হবে। ঠিক বটে

স্থিতপ্রজ্ঞ একই, কিন্তু তাদের ভূমিকার বিভিন্নতা আছে। এক কর্মযোগের ভূমিকা, আর এক ধ্যান-ভূমিকা। 'যা নিশা সর্ব-ভূতানাম্' এই সূত্রে কর্মযোগীর ভূমিকার আচার-সূত্র বলা হয়েছে। এতে তার জাগ্রত বিবেকশক্তির বর্ণনা আছে। সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে সে সদা হুঁশিয়ার এবং সৎ গ্রহণ করে অসতের নিরাকরণ করা তার কর্মযোগ-স্থিতির ভূমিকা। সমুদ্রোপমার শ্লোকে তার ধ্যানযোগের ভূমিকার ভাব বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার ভাবনার ব্যাপকতার ও দিব্যতার দর্শন মেলে। তার বিশাল ও উদার দৃষ্টির পরিধিতে সারা বিশ্ব এসে যায়। তার দৃষ্টিতে সবই শুভ, সবই পাবন, সবই মঙ্গল।

১৪৬. শুভ+অশুভ=শুভ। কেননা, অশুভ=০

বস্তুত জগতে অশুভের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। শুভের অঙ্গ হতেই অশুভের উৎপত্তি। অশুভ মানে শুভের ছায়া। ছায়ার দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব নষ্ট হয় না। তাতে পার্থক্যও ঘটে না। উল্টো বস্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একেবারে সাদা কাগজে বিনা রঙে ছবি আঁকতে যান ত ছবি ফুটবে না। সাদা কাগজ সাদাই থেকে যাবে। কেবল শুভ অব্যক্তই থাকবে। সাকার হবে না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে শুভ ফুটে উঠুক এই লোভ থেকে অশুভের উৎপত্তি। মানুষের ছায়ার মূল্য নাই। এই জেলে পঞ্চাশ জন কয়েদী। তাদের পঞ্চাশ, শ বা দেড় শ ছায়া পড়তে পারে। তা বলে কয়েদীদের গণনাকালে কেউ শ, দেড় শ বা দু শ গুনবে না। কারণ, ছায়ার সত্তা নাই। অর্থাৎ তা অভাবই বটে। আঁধারের বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে আমরা আলোর অভাব বলি। আলোককে আমরা অন্ধকারের অভাব বলি না। আঁধার বস্তু নয়। আলো বস্তু। আলোকে দেখানোই আঁধারের কাজ। শুভের রূপ দেখানোই অশুভের কাজ।

অতএব স্থিতপ্রজ্ঞ তা থেকে ভয় পায় না। তা দিয়ে তার বৃত্তির মাঙ্গল্য নষ্ট হয় না। বরং একথাই তার মনে হয় যে অশুভ শুভের উপকারই করেছে, শুভকে প্রকট করেছে, আকর্ষক বানিয়েছে। তার সর্বসংগ্রাহক ভাবনার কাছে সমস্ত শুভ-অশুভ বিশ্ব-স্বীকার্য মনে হয়। না, তার দৃষ্টিতে শুভ অশুভ মিলে শুভ হয়ে যায়। গণিতের ভাষায় বলতে গেলে তার দৃষ্টি হচ্ছে এরূপ—শুভ+অশুভ=শুভ। কারণ, অশুভ =০. তা হয়ত এই শূন্যের দরকার কি? চাওয়াই বা কেন? কারণ, তা গণিতের বীজ। শূন্যের কোন মূল্য নাই; তা হলে কি হয়, একের পর শূন্য বসান ত হয় দশ। তার সান্নিধ্যে একের প্রভা উজ্জ্বল হয়। শুভের শোভা খুলে ধরে বলে অশুভও যেন সুশোভিত হয়।

১৪৭. অশুভ মিথ্যা, সাধনা মিথ্যা, অশুভের মরণ মিথ্যা, শুভই কেবল সত্য—একে বলে ভাবাবস্থা

খুব ত সুবিধার এই তত্ত্বজ্ঞান এরূপ মনে করে অশুভের লোভে কেউ শুভাশুভের মিশ্রণকে মেনে নেয় ত বুঝতে হবে সে আত্মহত্যা করে বসেছে। অশুভ মিশ্রিত শুভ সে ত অশুভই। বিষমেশানো ভাত বিষই। অতএব যে লোক নীতিশাস্ত্রকে শুভাশুভের মিশ্রণের ওপর দাঁড় করাবার কথা বলে সে আত্মনাশের পথই ধরে। স্থিতপ্রজ্ঞের দৃষ্টি তা নয়। সে অশুভকে অশুভ বলে গ্রহণ করে না। অশুভের মোহ তার নাই। কর্ম করার কালে শুভাশুভের বাছবিচার করতে তার কখনও ভুল হয় না। এ ত আমরা দেখেছিই। কিন্তু তার কৃতি ও দৃষ্টিতে ব্যবধান থাকে। জগতে অশুভ কিছুই নেই এটা তার জগদ্‌বিষয়ক দৃষ্টি। ভালোর সম্বন্ধে যেমন মন্দের সম্বন্ধেও সে তেমন বলে, "তোরা সবে আয়। সব আমারই।" "আমরা অশুভ" একথা তারা বলে ত

সে বলবে, "নিজেদের তোমরা অশুভ বলছ বটে, বস্তুত তোমরা অশুভ নও। বল, আমরা অশুভ নই।" এর পরেও যদি তারা বলতে থাকে "আমরা অশুভই," ত সে তাদের পবিত্র করে দেয়। তার পাবন দৃষ্টিতে অশুভ শুভ হয়ে যায়। অশুভ ত ভ্রম। ভূত বা প্রেতেরই ন্যায় অশুভের স্থিতি। শিক্ষক বালককে বলে, "ভূত নেই, প্রেতও নেই।" বালকের মন তাতে সায় দেয় না। সে বাড়ী যায়, মাকে বলে, 'ঐ না ভূত দেখা যাচ্ছে! নেই কেমন?' তখন মা বলেন, "ভাল, এই নে, মন্ত্র দিয়ে মেরে ফেলছি।" ছেলের মনে হয়, মা মন্ত্র দিয়ে ভূতপ্রেতকে একেবারে শেষ করেছে। তার সংশয় ঘুচে যায়। জ্ঞানী বলে, "তোমরা সকলে শুভ। তোমাদের কোন ত্রুটি নেই। তোমাদের কিছু হয় নি।" তবু যারা বলে, আমরা কিছুটা বিগড়ে গেছি, তাদের সে বলে, "তোমাদের আমি মন্ত্র দিচ্ছি, সাধনার পথ দেখাচ্ছি।" কিন্তু তা কেবলমাত্র প্রেত মেরে ফেলার জন্যই। অশুভ মিথ্যা, সাধনা মিথ্যা, অশুভের মরণ মিথ্যা, একমাত্র শুভই সত্য। জগতে শুভ ছাড়া আর কিছু নেই এরূপ যার দৃষ্টি সে শান্তি লাভ করে, একথা কি কথায় বলার দরকার আছে?

পঞ্চদশ ব্যাখ্যান

এক

১৪৮. স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণের উপসংহার। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন কামনা নাই, জিজীবিষা নাই

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্ চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিং অধিগচ্ছতি ॥

অর্থ—'সর্ব কামনা ছেড়ে যে পুরুষ নিঃস্পৃহ্ভাবে বিচরণ করে, যার অহংতা ও মমতা চলে গেছে সে শান্তিরূপই হয়ে গেছে।' এটি স্থিতপ্রজ্ঞ প্রকরণের উপসংহার-বাক্য। কামনাত্যাগের কথা দিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ আরম্ভ হয়েছে। এখানে তার উপসংহারও কামনাত্যাগ দিয়েই করা হয়েছে। সর্ব কামনা ছেড়ে যে নিঃস্পৃহ হয় সে শান্তি লাভ করে—এ হচ্ছে অন্তিম বাক্য। স্পৃহা বলতে বাসনা কিংবা কামনা বুঝায়। তা ত ছাড়াই হয়েছে। তবে আবার নিঃস্পৃহ বলার দরকার কি? সর্ব কামনা ছাড়লে স্পৃহাও তাদের সঙ্গে ছাড়া হয়। তবে নিঃস্পৃহ শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? 'সর্ব কামনা যে ছেড়েছে এবং ফের স্পৃহাও ছেড়েছে' এরূপ বলাতে পুনরাবৃত্তি নেই। স্পৃহা শব্দ দ্বারা এখানে মূল 'অভিলাষ'-এর অর্থাৎ বেঁচে থাকার অভিলাষের কথা বলা হয়েছে। তার বিশেষ উল্লেখ ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-ন্যায় অনুসারে করা হয়েছে। যজমান ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করেছে। আহারের সময়ে জিজ্ঞাসা করল সকল ব্রাহ্মণ এসেছেন কি? উত্তর -ল, 'হাঁ সকলে এসেছেন'। আবার জিজ্ঞাসা

করল, 'ঐ সন্ন্যাসীরা ?' উত্তর এল, 'হাঁ তাঁরাও এসেছেন'। সন্ন্যাসীদের ত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই ধরা হয়েছিল। তবুও সন্ন্যাসীদের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রমবশত বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করা হল। এরই নাম 'ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-ন্যায়'। এই ন্যায়ানুসারে এ শব্দ (স্পৃহা) এখানে এসেছে। তার সর্ব কামনা দূর হয়েছে বলার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, 'সর্ব কামনা দূর হয়েছে মানে জীবন-বিষয়ক কামনাও দূর হয়েছে ত ?' বললে, 'হাঁ'। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে সকল অবাস্তর কামনা দূর হয়ে গেলেও বেঁচে থাকার বাসনা থেকে যেতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'তাও কি তিনি ছেড়েছেন ?'

১৪৯. মুমূর্ষাও নয়, মরণের ভীতিও নয়

বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছাড়ে ত 'মরণের ইচ্ছা করে' এই কি মানে ? না। বেঁচে থাকার ইচ্ছার সাথে সাথে মরার ইচ্ছাও ছেড়ে দেয়, এরূপ বুঝতে হবে। কিন্তু বলা হবে—'মরণের ইচ্ছাও কারো হয় কি ?' এর উত্তর এই যে কখন কখন হয়। মানুষ আত্মহত্যা করে, এ আমরা দেখতে পাই। স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তা নয়। বেঁচে থাকার ইচ্ছা যেমন সে দূর করে দেয়, মরণের আগ্রহও সে তেমন দূর করে দেয়। তার অর্থ এই নয় যে সমগ্র জীবনের প্রতিই তার ঔদাসীন্য এসে যায়। কোন কোন বৃদ্ধ লোককে বলতে শোনা যায়, আমার আর কদিন বাকী আছে। দশ গেছে পাঁচ আছে। জীবনরস তাদের শুকিয়ে গেছে। তার ফলে তারা উদাসীন হয়ে যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতি একেবারে উল্টো। জীবনের অভিলাষ দূর হয়ে যায় বলে মৃত্যুর ভয় তার মিটে যায়। বাকী থাকে তখন কেবল আনন্দ, কেবল খেলা। জীবন হয়ে যায় লীলাময়। পরে দশম অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ বলতে

গিয়ে 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ' বলা হয়েছে। সন্তুষ্ট হয়ে তখন সে ক্রীড়া করতে থাকে। 'তুকা ম্হণে মুক্তি পরিণিলী নোবরী। আতাং দীশ চারী খেলী মেলী॥' অর্থাৎ, তুকা কহে, হয়েছে মুক্তি-বধূর সনে পরিণয়। চলেছে এবে সর্বঠাঁই মধুর পরিচয়। এমনটাই জীবন তার আনন্দময়।

১৫০. জীবনের অভিলাষই বাস্তবিক মরণের ভীতি। তা দূর হয়ে গেলে জীবন আনন্দময় হয়

জীবনে অভিলাষই বস্তুত মরণের ভীতি। একই বস্তুর তা দুই দিক। যুদ্ধে যে সৈনিক যায় সে অনুক্ষণ হাসি তামাশায়, খেলাধূলায়, নাচাকোঁদায় মত্ত থাকে। পাস্কেল বলেন, 'মৃত্যু তার সামনে অনুক্ষণ খাড়া তাই সে এরূপ করে।' তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টায় সে আনন্দের আভাস সৃষ্টি করে। মনে জীবনাভিলাষের শল্য কথান্তরে মৃত্যুর শল্য বিঁধতে থাকে। ঐ দুঃখ ভোলার জন্য হেসে খেলে উন্মাদের অবস্থা আনতে চেষ্টা করে। আনন্দের এরূপ ভান জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। খুব হাসিখুশি, খোশমেজাজী লোক আমরা দেখতে পাই। তাদের নিকট-পরিচয়ে এলে দেখা যায় যে তাদের অনেকেই অন্তরে দুঃখী। দুঃখের ঐ শেল ভুলে যাওয়ার জন্য জেনে-শুনে হাস্য-পরিহাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। মনের গ্লানি চাপা দেওয়ার তা প্রযত্ন। জীবনাভিলাষ মনুষ্যজীবনের সর্বাপেক্ষা যাতনাদায়ক শল্য। মৃত্যু পর্যন্ত তা সদা বেঁধে আর মৃত্যুর পরেও পিছু পিছু হাঁটে। তাই এই দুঃখ ভুলে থাকার জন্য নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কৃত্রিম আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আকুল চেষ্টা সে করে। কিন্তু যে বেঁচে থাকার

বাসনাই ছেড়ে দেয় তার সকল দুঃখ আপনা থেকেই নাশ হয়ে যায়। জীবনের শল্যও দূর হয়ে যায়। সকল চিন্তা শেষ হয়। জীবন শুদ্ধ আনন্দময় হয়।

১৫১. 'চরতি' পদ দ্বারা একথাই সূচিত হয়েছে

শিশুদের জীবনে যে আনন্দ দেখা যায় তার রহস্যও এই। জীবনের ভাবনা তাদের নেই। অর্থাৎ তার মূলে আছে অজ্ঞান। কিন্তু তার কোনই ভাবনা নেই, একথা সত্য। শিশু খেলায় মত্ত থাকে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধও তার থাকে না। মায়ের লাগে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা। তার কোন খেয়ালই শিশুর থাকে না। শিশুর এই যে অজ্ঞানমূলক দশা তা-ই স্থিতপ্রজ্ঞের জ্ঞানমূলক দশা। সেকথাই এখানে বলা হচ্ছে। এখানেই 'চরতি' শব্দের মাধুর্য। 'চরতি' মানে খেলে, লাফায়, বিচরণ করে। তার জীবনে দুঃখের লেশও নেই। নিগমনে প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখ করা হয়ে থাকে। 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিজ্ঞার স্বরূপ একমুখো নয়। সর্ব কামনা ছেড়ে দেয় একথাই মাত্র মূল প্রতিজ্ঞায় বলা হয়নি। আত্মাতেই সন্তুষ্ট এই দ্বিতীয় লক্ষণও তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিজ্ঞার এই উভয়বিধ অর্থ নিগমনেও আসা চাই। সকল কামনা ত্যাগ করার পরে নিজ আত্মায় যে আনন্দের ঝরনা রয়েছে তাতে সে ডুবে যায়। সেই অর্থ এখানে 'চরতি' শব্দ দ্বারা ফোটানো হয়েছে। বাইরের বাসনা শেষ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট আছে অন্তরের পরিস্রুত আনন্দ।

দুই

১৫২. 'চরতি'-র অর্থ 'বিষয়ান্ চরতি' নয়

'চরতি' শব্দের এথেকে ভিন্ন এক অর্থ প্রচলিত হয়েছে। গীতা-রহস্যে তিলক তা বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্বের এক শ্লোকে 'বিষয়ান্ চরন্' এরূপ পদের ব্যবহার আছে। তাঁর মতে 'চরতি' শব্দের এখানে তেমন অর্থ করতে হবে। সংযমপূর্বক ইন্দ্রিসমূহের উপযুক্ত ব্যবহার সে করে এরূপ দাঁড়ায় এখানে 'চরতি'র অর্থ। এই অর্থও অঠিক নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার আদৌ করবে না, তা নয়। চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা ইত্যাদি তার পক্ষে ত্যাজ্য নয়। সেবার জন্য সে এই সব করবে। কিন্তু এরূপ অর্থ করার দরকার এখানে নাই। কারণ এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ণ ব্যাখ্যার নিগমন হয়েছে। তাই 'বিষয়ান্ চরন্'-রূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নয়। তা ছাড়া ওখানে 'চরন্' সকর্মক। এখানে 'চরতি' অকর্মক। অকারণে কর্মের অধ্যাহার কল্পনা করা ঠিক নয়।

১৫৩. 'চরতি' মানে আশ্রম-সন্ন্যাস নয়

স্মৃতি-বচন অনুসারে আর এক অর্থ করা হয়। স্মৃতির বিধান, সন্ন্যাসী পুরুষ সর্ব সঙ্গ ত্যাগ করে সতত ঘুরতে থাকবে। 'চরতি' শব্দে সেকথা মনে পড়ছে। স্থিতপ্রজ্ঞের জন্য কোন বিধান দেওয়ার প্রবৃত্তি গীতার নাই। কারণ যে স্থিতিতে বিধান দরকার সে স্থিতি সে পার হয়ে গেছে। স্মৃতির বিধান আশ্রম-সন্ন্যাসের জন্য। সাধকাবস্থার কথা ভেবে তা করা হয়েছে। নানা প্রকার অভিজ্ঞতালাভের পরে সাধক অনাসক্ত থাকবে,

এক জায়গায় থেকে আসক্তির জালে সে জড়াবে না। সতত ঘুরতে থাকবে, অর্থাৎ পরিগ্রহকে দানা বাঁধতে দেবে না। এ হচ্ছে স্মৃতির বিধান। স্থিত-প্রজ্ঞকে এরূপ বিধান কে দেবে? বিধানে তার দরকারই বা কি? তার বিধান সে নিজেই জানে। ভাল, বিধান না বলে বর্ণনা-ই যদি বলা হয়, তবুও কথা থেকে যাচ্ছে যে জ্ঞানীপুরুষের স্থূল চরিত্র বর্ণনা করার কোনই প্রবৃত্তি গীতার নেই। এরূপ স্থূল চরিত্র গীতা কল্পনাও করে নাই। তবুও যদি কেউ বলে যে 'চরতি' শব্দ সন্ন্যাস-আশ্রম-বিষয়ক স্মৃতিবচনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর প্রতীকরূপে কেউ তার উপযোগ করে ত আমাদের (তাতে) আপত্তি নাই। তা হলেও ঐ শব্দেব এখানে তেমন আক্ষরিক অর্থমাত্র হতে দিতে পারি না।

১৫৪. 'চরতি' মানে বিহার করে। জ্ঞানদেবের কথায় 'বিচরে বিশ্ব হয়ে বিশ্বমাঝে'

এখানে যেমন পরে ভক্তের লক্ষণে তেমন 'অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ' এরূপ গূঢ় লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তারও অক্ষরার্থ 'তার কোন ঘর নেই' অর্থাৎ 'সে সতত বিচরণ করতে থাকে,' এরূপ হতে পারে। কিন্তু এই অর্থ পরিপাক করে জ্ঞানদেব তা থেকে নূতন ও সরস নির্যাস বার করেছেন। "বায়ুসি এক ঠাঈঁ। বিঠার জৈসেঁ নাহীঁ। তৈসা ন ঘরী চ কহীঁ। আশ্রয়ো জো॥ হেঁ বিশ্ব চি মাঝেঁ ঘর। ঐসী মতি জয়াচী স্থির। কিংবহুনা চরাচর। আপন জালা॥" "বায়ু যেমন কোন এক স্থানে ডেরা বাঁধে না তেমন সে কোথাও আশ্রয় নির্মাণ করে না; সারা বিশ্বই আমার ঘর যার মতি এরূপ স্থির হয়েছে—সংক্ষেপে নিজেতেই যে চরাচর হয়ে গেছে, সে ত গৃহহীন নয়!" সারা বিশ্বই তার ঘর

হয়েছে। গৃহহীন সে হয়নি। এরূপই বিচারশীলতা জ্ঞানদেব এই অর্থ করতে গিয়ে এখানে দেখিয়েছেন। 'চরতি' শব্দের অর্থ এখানে তিনি করেছেন—'বিশ্ব হয়ে বিচরে বিশ্ব মাঝে।' অক্ষরার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় আবার বুঝতে কষ্ট না হয় এমনই নিপুণভাবে ভাষ্য করার কৌশল জ্ঞানদেব এখানে দেখিয়েছেন। সংস্কৃতে জ্ঞানীপুরুষের সঞ্চরণকে বিহার বলে। আমাদের দেশে বিহার ওরফে বিহার নামে কাশীর পূর্ব দিকে এক প্রদেশ আছে। কোনও জ্ঞানীপুরুষের বিহারের স্মৃতিস্বরূপে কোন প্রদেশের নামকরণের দৃষ্টান্ত বিরল। বুদ্ধের বিহারের স্মৃতিস্বরূপে আমাদের ধর্মপ্রাণ পূর্বজগণ ঐ প্রদেশের নাম রেখেছেন 'বিহার'। বিহার মানে স্বচ্ছন্দমনে ভ্রমণ করা, ক্রীড়া করা, খেলা। এই অর্থের দিকেই এখানে 'চরতি' শব্দের ইঙ্গিত। সকল কামনার এবং জীবনস্পৃহারও অন্ত হলে জীবন বিহার বা ক্রীড়াই হয়ে যায়।

১৫৫. কামনা ও জীবনাভিলাষ দূর হলে বাকী থাকে দেহ। তা কেবল উপকারের জন্য। 'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ' পদ দ্বারা একথাই বলা হয়েছে

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে—যার জীবনাভিলাষ পর্যন্ত বাকী নাই, বাকী আছে মাত্র শরীর তার আর জগতে কি কার্য থাকতে পারে? তত্ত্বজ্ঞানে এই প্রশ্ন প্রায়শ উঠে থাকে। কারণ, সিদ্ধান্ত এই যে কার্য নাই ত কোন বস্তুও নাই। এই প্রশ্নের উত্তর তুকারাম দিয়েছেন, 'তুকা ম্হণে আতাঁ। উরলোঁ উপকারপুরতা॥' তুকা কয় এবে। থাকল অবশিষ্ট উপকারার্থে॥ স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতি হয় এইরূপ—সে বিশ্বময় হয়ে যায়, আমি ও আমার

এই ভাষাই দূর হয়ে যায়। লোকেদের সে বলে, 'এখন আমি নাই, আমার নাই। যা কিছু আছে সে তোমরা ও তোমাদের। তো॰॰া তা বুঝে নাও।' এই অর্থই পরের চরণে—'নির্মমো নিরহংকারঃ' চরণে—ফুটে উঠেছে। সর্বভূতের উপকার করার জন্যই সে বেঁচে থাকে। কিন্তু তার দেহের সামাজিক কার্য থাকলেও তার নিজের সামাজিক কামনা মোটেই নাই। তার ব্যক্তিগত কামনা দূর হয়ে গেছে, সামাজিক কামনা অবশিষ্ট আছে এরূপ অর্থ যেন কেউ না করেন। সর্ব কামনা বলতে সামাজিক কামনাও বুঝায়। তা-ও সে ত্যাগ করেছে। তা হলে তার দ্বারা সামাজিক কার্য কি করে হয়? তার সাধকাবস্থার ধারা ও সামাজিক আবশ্যকতার প্রবাহ তাকে দিয়ে তা করিয়ে নেয়। সাধক-অবস্থার প্রেরণা স্বভাবে পরিণত হওয়ার দরুন অঙ্গরূপ হয়ে যায় এবং সমাজের আবশ্যকতার প্রবাহ ত বইছেই। এই দুই তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়। এভাবে সে কেবল প্রবাহ-পতিত হয়ে যায়। এরূপ যার স্থিতি সে শান্তি পাবে এতে আর আশ্চর্য কি? শান্তিতে ত তারই অধিকার। কারণ, অশান্তির সকল কারণ তার জীবন থেকে দূর হয়ে গেছে। অহংতা গেছে, মমতা গেছে, শুভাশুভ কামনা গেছে, জীবন-স্পৃহা গেছে তবে অশান্তি আর কাকে আশ্রয় করে থাকবে? তখন বাকী থাকে কেবল শান্তিই।

তিন

১৫৬. পূর্বোক্ত ভাবাবস্থা ও ক্রিয়াবস্থা হতে ভিন্ন স্থিতপ্রজ্ঞের এই জ্ঞানাবস্থা একেবারেই অবর্ণনীয়

পূর্ব শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের ভাবাবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার জ্ঞানাবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তা যেন ঐ ভাবাবস্থা থেকে একেবারে

উল্টো মনে হয়। ওখানে শুভাশুভ সকল কামনার প্রবেশ আছে। এখানে ঐ দুইয়ের প্রবেশ নিষেধ। জ্ঞানাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞ শুভাশুভ এই দুইয়ের উর্ধ্বে উঠে যায়। সেখানে কোন দ্বন্দ্বের লেশ থাকে না। সেখানে না আছে সৃষ্টি, না আছে দৃষ্টি। সেখানে ব্রহ্মাণ্ড নেই, পিণ্ড নেই। সেখানে নাই এই, নাই ওই। নাম নেই, রূপ নেই। নাই গুণ, নাই কর্ম। জাতি নাই, ব্যক্তি নাই। সাধারণ নাই, অসাধারণ নাই। ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই। বুদ্ধি নাই, অহংকার নাই। তবে আছে কি? বর্ণনার অবলম্বন নাই। কারণ, সেখানে বাণীর অবশেষ নাই। যেখানে বাণী অবশিষ্ট আছে, অবস্থা সেখানে তদ্রূপ নয়। সেখানে স্বানুভূতি আছে একথা বলাও ভুলই হবে। তাকে শূন্যও বলা যায় না। অশূন্যও তা নয়। কিন্তু কিছু ত বটেই, এটা নিশ্চিত। সেখানে ভাবাবস্থার ভাব থমকে দাঁড়ায়। ক্রিয়াবস্থার ক্রিয়া লোপ পায়। সেই অবস্থার এর চাইতে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এতটা বর্ণনার পরেও তার ওপর কোন আলোকপাত হয় নাই।

১৫৭. ভাবাবস্থায় সমগ্রতা রয়েছে

কিন্তু ভাবাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিকা হয় এই—ভগবান হয়ে যান তখন তার কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ। তার ভাবনাতে তখন সমগ্রতা আসে। সেখানে বিশ্লেষণ নাই। কেউ কোন সুন্দর মূর্তির নাক কেটে এনে আমায় যদি জিজ্ঞাসা করে, 'এ সুন্দর কি?' ত আমি বলব গোটা মূর্তিটা সুন্দর। তা টুকরো কর ত সুন্দরতা ঐ টুকরোয় নয়, সৌন্দর্য সমগ্রে। শুভ অশুভ মিলে এই সমগ্র বিশ্ব মঙ্গলময়। এটা হচ্ছে বিশ্বরূপে মিশে লীন হয়ে যাওয়ার, বিশ্বরূপ আদর করার, পূজা করার, তাতে একেবারে লয় হয়ে যাওয়ার ভূমিকা। 'করো পূজা, করো দেবদর্শন।' মূর্তির

পূজা করে তা দেখ ত সুন্দর দেখাবে। 'বীজ বোনো, ক্ষেতে যাও।' বীজ না বুনে ক্ষেতে যাও ত দেখবে তথায় আগাছার বিলাস-বৈভব। নিজ পবিত্র ভাবনার উড়ুনি বিছিয়ে জগৎ দেখ ত জগৎ পরম পবিত্র দেখাবে। মা নিজ প্রেমের সাজে সন্তানকে সাজায়, প্রেমের ভূষণে ভূষিত করে তাই তাকে সে সুন্দর দেখে। আত্ম-ভাবনা দিযে বিশ্বকে সাজাও, উদ্‌ভাসিত কর, মণ্ডিত কর, আচ্ছাদিত কর আর তার পরে দেখ। আত্মীয়তার কারণে তা সুন্দর দেখাবে, প্রিয় হবে।

১৫৮. ক্রিয়াবস্থায় বাছবিচার রয়েছে

এই দুই থেকে ভিন্ন বিবেক-প্রধান ক্রিয়াবস্থার কথা "যা নিশা সর্ব ভূতানাম্" শ্লোকে বলা হয়েছে, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এখানে শুভ-অশুভের ঝগড়া আছে। আছে নিষ্কামতার বিরুদ্ধে সকামতার, অকর্তৃত্ব বনাম কর্তৃত্বের, সংযম বনাম স্বৈরাচারের, সৎ-এর বিরুদ্ধে অসৎ-এর, আলোর বিরুদ্ধে আঁধারের লড়াই।

১৫৯. এই তিন অবস্থা মিলে স্থিতপ্রজ্ঞের একই অখণ্ড বৃত্তি

শরীর আছে বলে জ্ঞানীপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই তিন অবস্থা হয়। তাঁর বৃত্তির অখণ্ডতায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে তারা আসে-যায়। তাঁর 'বৃত্তি' আছে বস্তুত একথাই ঠিক নয়। বস্তুত তাঁর কোনই বৃত্তি নেই।

"করণেঁ কাঁ ন করণেঁ। হেঁ আঘবেঁ তো চি জাণ।
বিশ্ব চলতসে জেণেঁ। পরমাত্মেনি॥"

অর্থাৎ "জগৎ চলছে যার ইঙ্গিতে সেই পরমাত্মাই জানেন কি কর্তব্য আর কি অকর্তব্য।" এরূপ হচ্ছে তাঁর স্থিতি। ভগবান তাঁকে দিয়ে

যেরূপ কার্য করাতে চান, সমাজের যেরূপ আবশ্যক, তা-ই হবে। তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কিছুই করেন না। মালী নিয়ে যায় যথা, জল যায় তথা। আখের ক্ষেতে নিলে আখের মিষ্টতা বাড়ে। সরষের ক্ষেতে নিলে সরষের ঝাঁজ বাড়ে। পেঁয়াজের কেয়ারিতে নিলে পেঁয়াজের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

"মোহোরী, কান্দা, উস। এক বাফা ভিন্ন রস।
উদকা নেলেঁ তিকডে জাবেঁ।"

অর্থাৎ 'সরষে, পেঁয়াজ, আখ। একই ক্ষেত, ভিন্ন ভিন্ন রস। জল যেখানে নেবে, সেখানেই যাবে। জলের নিজের অভিমান বলে কিছু নেই। এ করব, ও করব না, কিছু করবই বা কিছুই করব না—এরূপ আগ্রহ স্থিত-প্রজ্ঞের নেই। ঈশ্বর তাকে দিয়ে যা করাবার, করিয়ে নেবেন। তার নিজের কোন বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে না। অতএব তার স্থিতির বর্ণনার পক্ষে নিবৃত্তি শব্দই ঠিক হবে। কিন্তু বৃত্তি শব্দ ব্যবহার করতে চান ত অখণ্ড বৃত্তি বলুন। শরীর থাকার জন্য ক্রিয়াবস্থা, ভাবাবস্থা ও জ্ঞানাবস্থা, তার হয়। কিন্তু এই তিন ভূমিকায় বিরোধ নাই। সে কারণ তার অখণ্ড বৃত্তিতে ছেদ পড়ে না। ক্রিয়ার বেলায় সে সজ্জন ও দুর্জন বাছে। ভাবাবস্থায় সবকে সংগ্রহ করে। জ্ঞানাবস্থায় বলে, আমার কিছুই নাই। এরূপে অভিনয়ের তিন পালা তার চলে। এই তিন ভূমিকাকে আমি স্থিত-প্রজ্ঞের ত্রিসূত্রী বলি। এই ত্রিসূত্রীর আধারভূত মহান প্রমেয়ের আলোচনা কাল করব।

ষোড়শ ব্যাখ্যান

এক

১৬০. স্থিত-প্রজ্ঞের ত্রিবিধ অবস্থার মূলে ঈশ্বরের ত্রিবিধ স্বরূপ

স্থিত-প্রজ্ঞের যে অবস্থা আমরা দেখেছি স্থূল অর্থে তা ঈশ্বরেরই এরূপ বুঝতে হবে। তার অবস্থা ত্রিবিধ তার কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ ত্রিবিধ। স্থিত-প্রজ্ঞের ভূমিকার তা আধারস্তম্ভ। ঈশ্বরকে কেউ দেখে নাই। একথা বলার মানে মানুষকেও কেউ দেখে নাই। মানুষের বাহ্যরূপ প্রকট। তদ্রূপ ঈশ্বরেরও বাহ্যরূপ প্রকট। মানুষের অন্তঃস্বরূপ ঈশ্বরের অন্তঃস্বরূপের মতই অপ্রকট। মানুষের প্রকট রূপ ক্ষুদ্রাকার। তাই মনে হয় তা বোঝা যায়। ঈশ্বরের প্রকটরূপ এই অনন্তসৃষ্টি জোড়া। তাই তা বুদ্ধির অগোচর বলে মনে হয়। বস্তুত মানুষ ও ঈশ্বর দুইই সমান প্রকট কিংবা অপ্রকট। কিন্তু মানুষকে জানার যেমন সাধন আছে, ঈশ্বরের স্বরূপ জানারও তেমন সাধন আমাদের হাতে আছে। স্থিত-প্রজ্ঞ সে সাধন। সর্বস্থানে ও সর্বকালে যতদিন এরূপ স্থিত-প্রজ্ঞের উদয় হবে ততদিন ঈশ্বরের রূপ জানার সাধন আমাদের পাশেই আছে, একথা বলতে বাধা নাই। অতএব স্থিত-প্রজ্ঞকে মূর্তিমান ও ক্ষুদ্রাকার ঈশ্বরই মনে করুন। স্থিত-প্রজ্ঞের তিন ভূমিকা ঈশ্বরের তিন স্বরূপেরই ছায়া। এই তিন রূপের মিশ্রণে তাঁর পূর্ণরূপ। অতএব যা কিছু কল্পনা করা যায়, আর কল্পনা করা যায় না সব কিছুই তাঁতে এসে যায়।

১৬১. ঈশ্বরের প্রথম রূপ কেবল শুভ

ঈশ্বরের প্রথম রূপ অমিশ্র শুভ। মানুষের আকাঙ্ক্ষায় তা দেখা যায়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা সদা শুভ। অশুভ যে করে সেও শুভেরই আকাঙ্ক্ষী। যে মিথ্যাবাদী সেও চায় না যে কারো হাতে সে ঠকে। হিংসাপরায়ণ যে সেও চায় না কেউ তাকে মেরে ফেলে। মনুষ্য-হৃদয়ের এই শুভবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা হতেই নীতিশাস্ত্রের সৃষ্টি। শুভ যে কি তা নির্ণয় করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু শুভ বলে কিছু আছে। আর তাই মানুষের প্রিয়। দৈবী সম্পত্তির সদ্‌গুণ বর্ণনার পরে, "অর্জুন, এই দৈবী সম্পত্তিতেই তোমার জন্ম" এই বলে যে আশ্বাস ভগবান অর্জুনকে দিয়েছিলেন সে কেবল অর্জুনের নিমিত্তেই নয়, সমগ্র মনুষ্যজাতিকেই সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। মানুষে দোষ দেখা যায় একথা ত ঠিক। কিন্তু তা হচ্ছে মানবে পশুত্ব, মানবত্ব নয়। মানবত্ব শুভ, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভের দিকে প্রগতিশীল। তার হৃদয়স্থান শুভে গঠিত। "হৃদ্‌-দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি", এ হচ্ছে তা।

১৬২. দ্বিতীয়—বিশ্বরূপ

ঈশ্বরের দ্বিতীয় রূপ মানে এই বিশ্বরূপ। তা পরিপূর্ণ। তাতে শুভাশুভ সব কিছু এসে যায়। কমলালেবুতে বীজ, ছিবড়ে, খোসা। ইত্যাদি সব আছে। মিষ্টি, টক, কষায় তিন রস বর্তমান। এই সব মিলে কমলালেবু। এই সব মিলিয়ে যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন কমলালেবু কেমন, ত আমি বলব, 'ভাল, মধুর, রুচিকর'। যে খাচ্ছে তার কাছে কমলালেবুর বীজ, ছিবড়ে, খোসার কোন মূল্য নেই। তা হলেও এই সবই ফলের রসে পোষক। এই সব মানুষের দৃষ্টিতে গৌণ। কিন্তু

তার দরুন কমলালেবুতে বৈগুণ্য আসে না। মানুষের দৃষ্টিতে বললাম তার হেতু এই যে ফলের পরিভাষায় ত বীজেরই স্থান মুখ্য। কিন্তু দৃষ্টান্তের কেবল সার গ্রহণ করতে হয়। সমগ্রভাবে জগৎ শুভ। কমলা-লেবুর মত মধুর। তাতে এই যে সব অশুভের আভাস তা শুভের শোভা-বৃদ্ধির নিমিত্ত। সে সব শুভের ছায়ারূপ। সে সব মিলে সম্পূর্ণ বিশ্বরূপ সুসজ্জিত। তা থেকে কখনও জন্মে ভীতি, কখনও প্রীতি। অর্জুন ভীত হয়েছিলেন সে কথা একাদশ অধ্যায়ে আছে। ভাগবতে বলা হয়েছে তা থেকে প্রহ্লাদের প্রেম উপজিত হয়েছিল। তা সমুদ্রের মত, হিমালয়ের মত রমণীয়-ভয়ানক। আকর্ষক ও বিকর্ষক। তাই শিবের দ্বিবিধ রূপের বর্ণনা করা হয়। 'মঙ্গল এবং ঘোর', 'সৌম্য ও রুদ্র'—এ হচ্ছে শিবের দ্বিবিধ রূপ। কিন্তু এই দুইএ মিলেই না শিব।

১৬৩. তৃতীয় রূপ—শুভাশুভের অতীত, ব্রহ্ম সংজ্ঞিত

ঈশ্বরের তৃতীয় রূপ শুভাশুভের অতীত। সৃষ্টির অতীত, বুদ্ধির অতীত, আকাঙ্ক্ষার অতীত। কিন্তু সকলের অতীত হলেও তা সকলের মূল আধার। তা বর্ণনা করা যায় না। তা শুভও নয়, অশুভও নয়—এরূপ ন-কারাত্মক বর্ণনা তার করা যেতে পারে। ইং-কার শব্দে একথাই মাত্র বলা চলে যে সে আছে। বাকী সবই 'নেতি নেতি'। বেদান্তে তাকে ব্রহ্ম সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

১৬৪. গীতার পরিভাষায় 'সত্', 'সদসত্', 'ন সত্, নাসত্'

গীতায় বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ রূপের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে 'মানবীয় আকাঙ্ক্ষার রূপ' প্রথম। তা নিছক শুভ। ভক্তেরা একে

চতুর্ভুজ বলে কল্পনা করেছে। মানব-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বলে বস্তুত তা মানবরূপ। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনে তার পূর্ণ প্রকাশ হয় না বলে আরও দুই হাত জুড়ে দিয়ে তাকে চতুর্ভুজ বানানো হয়েছে। পরমেশ্বরের পবিত্র, শুদ্ধ, শুভ, মঙ্গল রূপ নিজের হৃদয়ে অনুভব করাই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করা। গীতায় একে 'সৎ' বলা হয়েছে। ওম্ তত্ সত্-এর মধ্যে যে সত্ সে-ই এই। তার চিত্র চতুর্ভুজ, চরিত্র নীতিমান, নাম সত্। দ্বিতীয় বা বিশ্বরূপ দেখতে পাই একাদশ অধ্যায়ে। তাতে শুভাশুভের সমাবেশ হয়েছে। সমগ্রতা ও পরিপূর্ণতা ঐ স্বরূপের বিশেষতা। গীতায় এর শাস্ত্রীয় নাম 'সদসত্'। 'সদসচ্ চাহমর্জুন' এ বাক্যে এই বিশ্বরূপেরই বর্ণনা রয়েছে। তৃতীয় রূপ গুণাতীত। সেখানে আকার নেই, বিকার নেই, প্রকার নেই। কিন্তু তা সর্বাধার। গীতায় তার 'ন সত্ তন্ নাসদ্ (উচ্যতে)' এরূপ শাস্ত্রীয় নাম দেওয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে তার বিস্তার করা হয়েছে।

১৬৫. তর্কে সদসতের চার বিভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু তার তিনটি ঈশ্বরে প্রযোজ্য

এরূপে ঈশ্বরের তিন রূপ আর তদনুযায়ী স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা তিন। তর্কের বিচারে সদসত্‌কে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) কেবল সত্, (২) কেবল অসত্, (৩) সদসত্, (৪) ন সত্, নাসত্। কিন্তু তর্কে চার বিভাগ পাওয়া গেলেও তার মধ্যে তিনটি কেবল ঈশ্বরে প্রযোজ্য। কেবল 'অসত্' এ বিভাগ ঈশ্বরে প্রযোজ্য নয়। তা প্রযোজ্য শয়তানে। ঈশ্বরের চতুর্থ স্বরূপ নেই। তাই স্থিতপ্রজ্ঞেরও চতুর্থ স্থিতি নেই।

দুই

১৬৬. ঈশ্বরের আর তদনুসারে স্থিতপ্রজ্ঞের জীবনের এই ত্রিবিধ স্বরূপ 'জ্ঞান-যজ্ঞেন চাপ্যন্যে' এ শ্লোকে সূচিত হয়েছে

এই অর্থজ্ঞাপক একটি শ্লোক নবম অধ্যায়ে আছে। 'জ্ঞাপক' শব্দটি ভেবে-চিন্তেই ব্যবহার করছি। কারণ ঐ শ্লোকটির অর্থ সরল নয়। মহাভারতে ব্যাসদেবের যে সব বিশেষ বিশেষ শ্লোক আছে এটি তার একটি। তবু কিন্তু ভাষ্যকারেরা নিজ নিজ ভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন। আমার মতে আমরা যে কথার বিবেচনা করছি ঐ শ্লোকে সেই বিষয়ই সূচিত হয়েছে।

জ্ঞান-যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো-মুখম্॥

গী. ৯. ১৫

এই সেই শ্লোক। "জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা যে আমার ভজনা করে সে আমার ব্যাপক স্বরূপের ভজনা একরূপে, পৃথক পৃথকরূপে ও বহুরূপে করে" এ হচ্ছে এ শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ। একরূপে, পৃথক-পৃথকরূপে ও বহুরূপে ভজনাকারী এরা পৃথক-পৃথক জ্ঞানী নয়। তবুও একই জ্ঞানী তিন পৃথক পৃথক ভূমিকা হতে তিন প্রকারের উপাসনা করে। 'ন সত্ তন্ নাসদ্ উচ্যতে' এরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম-তত্ত্বের অদ্বৈতময় অনুভব মানে একত্ব দিয়ে পূজন। 'ঈশ্বর কেবল সৎ, অসৎ নন' এই ভূমিকা থেকে যে উপাসনা তা পৃথক্ত্বের ভূমিকা থেকে যজন। আর 'সৎ অসৎ মিলে সব জীবন এক' এরূপ ভূমিকা থেকে করা উপাসনার নাম বহুধা যজন।

১৬৭. এর আরও একটু বিশ্লেষণ

একই জ্ঞানীপুরুষের এই তিন অবস্থা। ক্রিয়াবস্থায় সে ঈশ্বরকে কেবল সত্-স্বরূপ দেখে। তার তখনকার ভূমিকা হচ্ছে পৃথক্ত্বের অর্থাৎ বিচারের ভূমিকা। কেউ কেউ পৃথক্ত্বের অর্থ করেন এরূপ, "আমি আর ঈশ্বর ভিন্ন এরূপ ভেদ-ভাবনা থেকে কৃত উপাসনা।" কিন্তু সে অর্থ ঠিক নয়। কারণ সাধারণ ভক্তির বর্ণনা এ নয়। এ জ্ঞান-যজ্ঞের বর্ণনা। ভক্তির বর্ণনা এর আগে 'সততং কীর্তয়ন্তো মাম্' শ্লোকে হয়ে গেছে। তাতে যত ইচ্ছে দ্বৈত কল্পনার সুযোগ আছে। এখানে দ্বৈত-ভক্তির কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ এ জ্ঞান-যজ্ঞ। এখানে পৃথক্ত্বের দ্বারা উপাসনা মানে সদসতের বিচার করা এরূপ অর্থ করা ঠিক হবে। 'বহুধা' মানে শুভ ও অশুভ উভয় স্বরূপের অনন্ত সাজে ঈশ্বর সজ্জিত এই ভূমিকা হতে উপাসনা। এ হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞের ভাবাবস্থার উপাসনা। এ থেকে সকলের প্রতি তার অবিরোধ-বৃত্তি সূচিত হয়েছে। এই শ্লোকের এরূপ অর্থ করলে গীতায় বর্ণিত ঈশ্বরের ত্রিবিধ স্বরূপেব সহিত সামঞ্জস্য হয়।

১৬৮. বাহ্য জীবনাকারে ভেদ দেখা গেলেও স্থিতপ্রজ্ঞ মাত্রেরই তিন অবস্থার অনুভব হয়

স্থিতপ্রজ্ঞমাত্রেরই জীবনে এই তিন ভূমিকা থাকে। কিন্তু তার মধ্যেও কারো জীবনে ক্রিয়াবস্থা প্রধান, কারো ভাবাবস্থা, কারো জ্ঞানাবস্থা। তদনুসারে তাদের বাহ্য জীবনে এই ব্যবধান দেখা যাবে। কিন্তু এদের মধ্যে কেবল একটি ভূমিকার অনুভব স্থিতপ্রজ্ঞের হয় তা নয়। হয় তিন ভূমিকারই অনুভব। তিন অবস্থার সাধারণ অখণ্ড

অনুভবও একই। তা হলেও প্রাধান্যহেতু বাহ্য জীবনে ব্যবধান হয়। তার ফলে বিভিন্ন জ্ঞানীদের মধ্যে তুলনা করার ভ্রম লোকের জন্মে। আর নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কেউ একে শ্রেষ্ঠ বলে ত কেউ ওকে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা মোহই। বাহ্য আকার যাই হোক, ভিতরের আকার যতক্ষণ এক ততক্ষণ বস্তুত কোন পার্থক্য নেই। পাঁচ টাকার নোটই হোক, কি পাঁচ টাকার মুদ্রা, মূল্য তার একই। ব্যবধান মাত্র আকারের। কিন্তু হোক না কোন এক ভূমিকার প্রাধান্য তবুও স্থিতপ্রজ্ঞের দ্বারা যে লোকসংগ্রহ হবার তা সমানই হতে থাকে। লোক-সংগ্রহ হয় তার আত্ম-জ্ঞানেরই হেতু। কোন অবস্থার প্রাধান্য হলেও ঐ আত্ম-জ্ঞানে ব্যবধান হয় না।

তিন

১৬৯. এই তিন অবস্থা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, একে অন্যের সহায়ক

এখানে আর একটা প্রশ্ন খাড়া হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের এই তিন অবস্থার কিছু সম্বন্ধ আছে কি নাই? জাগৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মানুষের এই তিন অবস্থা যেমন একে অন্য থেকে একেবারেই ভিন্ন, তদ্রূপই কি এই অবস্থা একেবারে ভিন্ন ভিন্ন? ঘুমের অবস্থায় মানুষের জাগৃতি থাকে না, জাগ্রত অবস্থায় ঘুম থাকে না, আর স্বপ্নের অবস্থায় দুইয়ের কোনটিই থাকে না। স্থিতপ্রজ্ঞের ক্রিয়াবস্থা, ভাবাবস্থা ও জ্ঞানাবস্থার স্থিতি কি তদ্রূপই, না তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে জাগৃতি-স্বপ্ন-সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, জাগৃতি ইত্যাদি সাধারণ লোকের মত জ্ঞানীদেরও আছে। যে কথার

আলোচনা আমরা করছি তা জ্ঞানী পুরুষের জাগ্রতিরই তিন অবস্থা। সূক্ষ্মভাবে দেখেন ত নিদ্রাদি অবস্থাও একেবারে সম্বন্ধরহিত নয়। নিদ্রার জাগৃতির উপর ও জাগৃতির নিদ্রার উপর খুবই প্রভাব পড়ে। ভাল ঘুম হয় ত জাগৃতিও ভাল। জাগৃতিতে মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করলে ঘুমও ভাল হয়। তদ্রূপ স্বপ্নের জাগৃতির উপর আর জাগৃতির স্বপ্নের উপর প্রভাব না পড়ে যায় না। আর জ্ঞানী পুরুষের ত জাগৃতিতেই তিন অবস্থা। তাই এই তিন অবস্থার প্রভাব একে অন্যের উপর পড়েই। এক অবস্থায় যখন থাকে তখন অপর অবস্থার ভূমিকাব প্রভাব তার উপর পড়বে না, এ সম্ভব নয়।

১৭০. এ বিষয়ে সনাতনীদের যুক্তি যুক্তিহীন

পণ্ডিতের দৃষ্টিতে "ব্রাহ্মণ, গাই, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল, এরা সব সমান" গীতার এই বাক্যটির আলোচনা করা দরকার। কেন না কোন কোন বেদান্তী এই গীতা-বচন দৃষ্টে বলেন যে, "এ বাক্য ভাবাবস্থার। ক্রিয়াবস্থায় এ কথা খাটে না। ভাবাবস্থায় সকলকে সমান মনে করলেও ক্রিয়াবস্থায় বাছ-বিচার করতে হয়। এই স্থূল বাছ-বিচার করে গাইয়ের সাথে গাইয়ের আর মানুষের সাথে মানুষের মত ব্যবহার করতে হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ ত পাগল নয়। ভাবাবস্থার অদ্বৈত-ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ক্রিয়াবস্থার বাছ-বিচার করতে যাওয়া মানে বটগাছে অশ্বত্থ গাছের ছাল লাগানো।" এই যুক্তিধারা অবলম্বনে সনাতনীরা বলে, "আপনারা মনে করেন যে আমরা ব্রাহ্মণ ও হরিজনে ভেদ করি। ভেদ তা নয়। তা বিচার। ভেদের সঙ্গে অভেদের বিরোধ হতে পারে, বিচারের সঙ্গে হতে পারে না।" তাদের একথা বিচার করে দেখার যোগ্য। যখন যে ভূমিকায় তখন তদনুরূপ অবস্থা থাকবে একথা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বিভিন্ন

অবস্থার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নাই তাদের যুক্তিবাদে এরূপ যে মেনে নেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। ভাবনার প্রভাব ক্রিয়ার ওপর, ক্রিয়ার প্রভাব ভাবনার ওপর আর জ্ঞানের প্রভাব দুইয়ের ওপর হবেই হবে। জ্ঞান ও ভাব অকিঞ্চিৎকর নয়। এরা দেশলাইএর বাকস নয় যে ইচ্ছা হল পকেটে রাখলাম, ইচ্ছা হল জ্বালালাম। জীবনে এরা বেমালুম মিশে আছে।

১৭১. ক্রিয়াবস্থার উপর ভাবনাবস্থার প্রভাব : দৃষ্টান্ত, সোনার আংটি ও সভার সভাপতি

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে আমরা ক্রিযাবস্থার ও ভাবাবস্থার তুলনা করব। বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, ক্রিযাবস্থার ওপরও সেই অবস্থার বিবেক (বাছ-বিচার) করা সত্ত্বেও ভাবাবস্থার প্রভাব পড়া চাই। আঙ্গুলে সোনা আমি পরতে চাই। যে কোন আকারের সোনা পরলে চলবে না। আংটির আকারে তা হওয়া চাই। সে আকারের না হলে তা আমার কাজের নয়। তাই তা আমি নেব না। কিন্তু ভিন্ন আকারের বলে আমি ফেলেও দেব না। কারণ, সোনার মূল্য আমার জানা আছে। ভাবাবস্থায় এই দর্শন আমার লাভ হয়েছে যে শুভ-অশুভ জগতে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্মস্বরূপ, নি-খাদ সোনা। মনে করুন, সজ্জনদের সভা ; সভাপতি দরকার। সে স্থলে তারা কোন স্থিত-প্রজ্ঞ সাধু-পুরুষকে সভাপতিপদে বরণ করবে। দুর্জনকে নির্বাচন করবে না। কিন্তু তা না করলেও দুর্জনের প্রতি তিরস্কার-ভাবও পোষণ করবে না। দুর্জনও এক আকারে পরমেশ্বরই। সজ্জন অন্য আকারের পরমেশ্বর। সজ্জনের সভার পক্ষে সজ্জনরূপী-পরমেশ্বরই উপযুক্ত বলে তাকে নির্বাচন করা হল। ক্রিয়াবস্থায় জ্ঞানী পুরুষ এভাবে চলে বলে যে সে ভেদ

আচরণ করে তা নয়। অন্তরে একত্ব উপলব্ধি করে সে বাহ্য আচরণে বাছ-বিচার করে। বাহ্য আচরণ আকারে ভিন্ন হলেও ভিতরে অভেদ-ভাব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে দিকে তার নজর থাকে। সমদৃষ্টিতে সে দেখে। তার মানে এই নয় যে প্লেগরোগীকে ও যক্ষ্মারোগীকে একই ঔষধ দেবে। ক্রিয়াবস্থায় তাকে আকার দেখে চলতে হয়। কিন্তু ভাবাবস্থার অনুভব তাকে বলে, বাছ-বিচার করলেও এই সবই যে ব্রহ্মরূপ একথা ভুললে চলবে না। কোন কিছুর অনাদর করবে না। সকলের প্রতি আদর পোষণ করবে।

১৭২. ভাবাবস্থার উপর ক্রিয়াবস্থার প্রভাব ঃ দৃষ্টান্ত, কুষ্ঠরোগী-সেবা

এক অবস্থার অনুভব ও জ্ঞান অন্য অবস্থায় ভোলা যায় না; ব্যবহারেও আমরা তাই দেখতে পাই। মানুষের সম্পূর্ণ একক ভূমিকা থাকতে পারে না। কোন রসিক বন্ধু এক মজার গল্প বলে থাকেন : গণিতের কোন অধ্যাপক বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কোন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—স্টেশন কোন দিকে ? অধ্যাপক বলেছিলেন, —'ভূগোল আমার বিষয় নয়।' গণিতের অধ্যাপকের ভূগোলের জ্ঞানে আদৌ দরকার নাই এই না ছিল অধ্যাপকের কথার তাৎপর্য। একথা ঠিক বটে যে ভাবাবস্থার সকল ভাবনা ক্রিয়াবস্থায় প্রযোজ্য নয়। তা হলেও ক্রিয়াবস্থায় ভাবাবস্থার তত্ত্ব ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং যে ব্যক্তিতে ভাবাবস্থার ভূমিকা প্রধান সেও ক্রিয়াবস্থার বাছ-বিচার উপেক্ষা করবে না। এ লবণ, এ চিনি, এ লাল রং, এ পাণ্ডুবর্ণ, এ বস্তু গোল, ওটা চৌকোণা এই বোধ তার থাকেই। কোন বাহ্য-কারণ-বশত ব্যক্তির বা সামাজিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে কোন লোককে যেমন কুষ্ঠরোগীকে

না ছোঁওয়া যদি কাল ইষ্ট বলে প্রতিপন্ন হয় তবে সে নিজেও ক্রিয়াবস্থায় তেমনি চলবে। সে এই মহারোগীর সেবা নিজে করবে, স্বয়ং বিপদের সম্মুখীন হবে, কিন্তু ঐ রোগ তাকে আক্রমণ না করে সেদিকে সে দৃষ্টি রাখবে। এর কারণ এই যে নিজে আক্রান্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য কুষ্ঠরোগীর রোগ দূর করা। তার যদি হয় হোক সে ঝুঁকি সে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু অন্যে আক্রান্ত না হয়, তাই ঐ রোগীকে সে সমাজ হতে দূরে রাখবে আর দরকার হলে নিজেও দূরে থাকবে। কিন্তু এই নিয়মনেও থাকবে ভালবাসা, দয়া ও আদর-বুদ্ধি। মহারোগীও ঈশ্বররূপ একথা সে ভুলে যাবে না। কিন্তু সমাজের রক্ষার নিমিত্ত সে সাবধানতা অবলম্বন করবে—এখানে এসে যাচ্ছে তার বিচার। কিন্তু অপবিত্র মনে করে মহারোগীদের সে যদি দূরে রাখে, তাদের সেবা না করে, তাদের ঘৃণা করে, তবে সর্বত্র ঈশ্বর-দর্শনের ভাবনা তার সমূলে নষ্ট হবে। সে স্থলে তার স্থিতপ্রজ্ঞতা আর কোথায় থাকছে? সবই এক। এটা ভাবাবস্থা, ক্রিয়াবস্থা নয়—সনাতনীদের একথা ঠিক। কিন্তু এই সব অবস্থা এক থেকে অন্য একেবারেই ভিন্ন—তাদের এ ধারণা ভুল। একই নিষ্ঠার তা বিভিন্ন রূপ। এভাবে বিচার করলে সনাতনীদের কথার সার বোঝা যাবে এবং অসারও ধরা পড়বে।

সপ্তদশ ব্যাখান

এক

১৭৩. ভাবদ্বারা ক্রিয়ার নিয়মন—অধিক বিবরণ

স্থিতপ্রজ্ঞের ত্রিবিধ অবস্থা আমরা বর্ণনা করছি। জ্ঞান, ভাব ও ক্রিয়া। এ তিন অবস্থা আক্রমণকারী নয় কিন্তু অনুগ্রহকারী ত বটেই। অর্থাৎ তারা একে অন্যেব ওপর চেপে বসে না, তা হলেও পরস্পরের ওপর পরস্পরের প্রভাব না পড়ে যায় না। ইন্দ্রধনুর বিভিন্ন রং নিজ নিজ ভাবে পৃথক দেখায় কিন্তু তাদের ছটা একে অন্যের ওপর চমকিত হয় আর সে সব মিলে হয় ইন্দ্রধনু। তদ্রূপ এই তিন অবস্থা মিলে জ্ঞানী পুরুষের জীবন রচিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভাব বনাম ক্রিয়া এই যদি স্থিতি হয় ত কি হবে, সে বিচার আমরা করেছি। ক্রিয়াবস্থার ওপর যদি ভাবাবস্থার অনুগ্রহ (প্রভাব) না থাকে তবে বিবেক (বিচার) ভেদে পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ হরিজনদের বিরুদ্ধে সনাতনীদের যুক্তিবাদ। বস্তুত এই যুক্তি অর্থহীন। কারণ, বিবেকের নামে সেখানে যা বলা হয়েছে তা বিবেক নয়, সেরেফ ভেদ। মনুষ্য-জন্ম পেয়েছে এমন কোন মনুষ্যকে লোকে জন্মত অস্পৃশ্য মনে করবে এতে বিচার কোথায়? তাই একে পরম্পরাগত মূঢ় ভেদই বলতে হবে। বিবেক ও ভেদ এ দুই একেবারেই পৃথক ভূমিকার বস্তু। খাদ্য ও অখাদ্যের বিচারকে বিবেক বলা যাবে। বিবেকের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা মহারোগীর দৃষ্টান্ত দিয়েছি। মহারোগীকে দূরে রাখতে

হয় কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতি, সেবাভাব ও আদর থাকা চাই। আলাদা রাখার মূলে যদি প্রেমের প্রেরণা থাকে ত তা হবে বিবেক। নয় ত তা ভেদই হবে। দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে বিচারক। বিচারকালে ন্যায়-অন্যায়-বিবেক ত করতে হবেই। নয় ত বিচার অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু কার্যের ওপর সর্বাত্মভাবের মোহর অঙ্কিত হওয়া চাই। কথাটা সিধে কথায় বললে, বিচারে দয়ার ফোড়ন থাকা চাই। তবেই তা ঠিক বিচার হবে। আত্মৌপম্য-বুদ্ধি বিনা বিচার প্রতিশোধের আকার নেবে।

১৭৪. জ্ঞানের দ্বারাও তদ্রূপ। তা থেকে নিষ্কাম কর্মযোগের জন্ম

ভাবদ্বারা যেমন ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ হওয়া চাই তেমন জ্ঞানদ্বারাও ক্রিয়ার নিয়মন হওয়া চাই। আমি শুভ ও অশুভ এই দুইয়ের অতীত, শুভ ও অশুভ দুইই আমার দৃষ্টিতে ত্যাজ্য, এ হচ্ছে জ্ঞানাবস্থার ভূমিকা। আর ক্রিয়াতে ত শুভাশুভ-বিবেক অবশ্যই আছে। এভাবে এই দুই ভূমিকা পরস্পরবিরোধী মনে হয়। কিন্তু তেমন মনে হলেও বস্তুত তারা একে অন্যের অনুগ্রাহক। জ্ঞানাবস্থা ও ক্রিয়াবস্থা ভিন্ন হলেও জ্ঞানীপুরুষের ক্রিয়ার উপর তার জ্ঞানের প্রভা চমকায়। তার জ্ঞানের রং তার ক্রিয়ার উপর চড়ে। তার ক্রিয়া তার জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত হয়, মণ্ডিত হয়। ক্রিয়াতে শুভাশুভ-বিবেক থাকলেও, শুভ ও অশুভ এই দুইই যে মিথ্যা এই বিষয়ে সে সচেতন। তার ফলে ক্রিয়াবস্থাতেও সে অলিপ্ত ও নিরহংকার থাকে। কেবল জ্ঞানাবস্থাতেই সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাসের ভূমিকা বিদ্যমান। ক্রিয়াবস্থায় সে শুভাশুভ বাছে। তাহলেও কিন্তু জ্ঞানাবস্থার জ্ঞানের কারণে তাতে অহংকারের বা লিপ্ততার ছোপ লাগে না। তা থেকেই নিষ্কাম কর্ম-যোগের জন্ম।

১৭৫. 'মুক্তের পথ ধরি লভে নিজমুক্তি'। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থার জ্ঞান সাধকের ও সমাজের আবশ্যক

এভাবে এই তিন অবস্থা পরস্পর সংস্পৃষ্ট, পরস্পর সংমিশ্র। এই তিনে মিলে স্থিত-প্রজ্ঞের এক পরিপূর্ণ ও দিব্য জীবন রচিত হয়। কিন্তু স্থিত-প্রজ্ঞের জীবনের এই দিব্য লক্ষণ জেনে আমাদের কি লাভ?—এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। তার উত্তর জ্ঞানদেব এ কথায় দিয়েছেন :

"মুক্তাতেঁ নির্ধারিতাং। লাভে আপুলী চি মুক্ততাং॥"

মুক্ত পুরুষের জীবনের চিন্তা করতে করতে' আমাদের নিজ মুক্তির দর্শন হয়। মুক্তি স্থিত-প্রজ্ঞের একচেটে অধিকার নয়। সকলেরই তা নিজ বস্তু। মুক্ত পুরুষের চিন্তন দ্বারা আপন হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার পথ লোকে পায়। তাই মুক্ত পুরুষের জীবনাদর্শ ও জীবন-স্পর্শ সাধক ও সমাজের পক্ষে আবশ্যক। স্থিত-প্রজ্ঞের স্থিতি তার নিজের কাছে স্বাভাবিক হলেও আমাদের পক্ষে তা প্রযত্নসাপেক্ষ আর তাই অনুকরণীয়। সে দিকে আমাদের যেতে হবে। জীবন তদভিমুখী করতে হবে। তাদের জীবন আদর্শ-লিপি : তা মকশ করতে হবে। গোটা সমাজের ঐহিক জীবনের সার্থকতা সেই জীবনের মোক্ষ-প্রবণতায়। জীবন মুক্তির সাধন হতে পারে একথা আমরা স্থিতপ্রজ্ঞের উদাহরণ হতে বুঝতে পাই। স্থিত-প্রজ্ঞে পাচ্ছি আমরা পরিপূর্ণ ও নির্দোষ আদর্শ। সাধারণ মানুষের প্রযত্নে দোষ থাকবে, অপূর্ণতা থাকবে। তা হলেও আত্মার স্বরূপ সর্বত্রই সমান বলে স্থিত-প্রজ্ঞের জীবনের তিন অবস্থার জ্ঞান সাধক ও সমাজের পক্ষে আবশ্যক।

দুই

১৭৬. স্থিত-প্রজ্ঞের ত্রিসূত্রী 'ওঁ তৎ সৎ' দ্বারা সূচিত

এ স্থানে ত্রিসূত্রীতে বর্ণিত বিষয় ভগবদ্‌গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্তে 'ওঁ তত্‌ সত্‌' মন্ত্র দ্বারা বলা হয়েছে। মন্ত্র শব্দাত্মক কিন্তু তার সামর্থ্য বিলক্ষণ। বস্তু-শূন্য তা নয়। কামানের গোলা অপেক্ষাও মন্ত্র বলবান। মন্ত্র জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মন্ত্রের প্রভাবে ও প্রেরণায় মানুষের জীবন আপনা হতে তদনুযায়ী হয়ে যায়। স্থিত-প্রজ্ঞের জীবনের রীত-রেওয়াজ সকলের জীবনে ফুটে উঠুক, তাই না গীতা কৃপাবশ হয়ে চিন্তামণিরূপ এই মন্ত্র আমাদের দিয়েছে। এভাবে তা বেদোপনিষদের সার বলে পরিগণিত হয়েছে।

১৭৭. প্রথম পদ ওঁ। ওঁ শব্দ ভাবাবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভাবনীয়

তার প্রথম পদ ওঁ। ওঁ মানে ঈশ্বর-তত্ত্ব। বিরাট, ব্যাপক, বিশাল। এরূপই সকলের সমাবেশকারী ব্রহ্মার সগুণ স্বরূপ। ওঁ অক্ষরও বটে, শব্দও বটে। শব্দ হিসাবে ওঁ-এর অর্থ 'হাঁ'। ওঁ হচ্ছে ঈশ্বরের হাঁ-রূপ।

"তুকা ম্হণে জেঁ জেঁ বোলা। তেঁ তেঁ সাজে যা বিঠ্‌ঠলা॥" 'তুকা ভনে যা যা বলি। সেই সেই রূপ ধরে হরি।' তুকারাম এভাবে ঈশ্বরের হাঁ-বাচক বর্ণনা করেছেন। সে কি সাকার?—'হাঁ'। সে কি নিরাকার? —'হাঁ'। সে কি শুভ?—'হাঁ'। সে কি অশুভ?—'হাঁ'। সগুণ কি?—'হাঁ'। নির্গুণ কি?; অণু কি?; মহান কি?; ইত্যাদি সকল

প্রশ্নের উত্তর—'হাঁ'। "ইদংময়ঃ অদোময়ঃ" সে এ ত বটেই আর তা-ও। কল্পনা যা করা যায়, আর যা করা যায় না এরূপ সব কিছু যে নিজ কুক্ষিতে ধরে এমন যে ব্যাপক, বিশাল, ভব্যরূপ ওঁ তারই সূচক। অতএব ভাবাবস্থার উপলব্ধির জন্য ওঁ শব্দ ভাবনীয়।

১৭৮. ওঁ অক্ষর বর্ণমাত্রেরই প্রতীক

অক্ষর হিসাবে ওঁ-কে বর্ণমাত্রের প্রতীক বলে মানা হয়। তার আরম্ভ 'অ' দিয়ে আর অন্ত 'ম' দিয়ে। এই দুইয়ের মিলন ঘটাচ্ছে ঘটক 'উ'। বর্ণমালার আরম্ভ 'অ' থেকে আর সমাপ্তি 'ম'-তে। বর্ণের উদ্‌গম কণ্ঠ থেকে আর সমাপ্তি হয় ওষ্ঠে। আদিবর্ণ 'অ'-এর উচ্চারণস্থল কণ্ঠ আর অন্তিম বর্ণ 'ম'-এর উচ্চারণস্থল ওষ্ঠ। ''ম'-এর উচ্চারণ করতে আমরা দুই ঠোঁট মেলাই, আর নাক থেকেও কিছুটা সহায়তা নিই। তাই 'ম'-য়ের পরে কোন বর্ণ নেই। 'ম'-য়ের পরে য, র, ল, ব ইত্যাদি বর্ণের গণনা করা হয়। কিন্তু তারা উচ্চারিত হয় মধ্যবর্তী স্থান হতে—কণ্ঠ ও ওষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান হতে। 'উ' কণ্ঠ ও ওষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান থেকে উৎপন্ন বর্ণের প্রতিনিধি। 'উ' মানে উভয়, এদিক ও ওদিক সংযোগকারী ঘটক—সব মিলে সকল সারস্বত, সকল সাহিত্য, সকল শুভাশুভ বাঙ্‌ময় ওঁ-তে এসে যায়। এই উপপত্তি কাল্পনিক ত বটেই, কিন্তু এভাবে সকল বাণীর এক প্রতীক কল্পনার মধ্যে ব্যাপক, বিশ্বরূপ, ঈশ্বর-তত্ত্ব চিহ্নরূপে ফুটে উঠেছে। তাই তা চিন্তন করা আবশ্যক।

১৭৯. ওঁ-এর ব্যুৎপত্তিঃ ওঁ একটি ধাতুরূপ

তুলনামূলক ব্যুৎপত্তির বিচার করতে গিয়ে আমার মনে হয়, ওঁ একটি ধাতুরূপ। 'সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকা' এ হচ্ছে ঐ ধাতুর অর্থ। যে স্বরূপ

ভূতমাত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা ওঁ। বস্তুত 'ওঁব' এই মারাঠী ধাতু অতি প্রাচীন অর্থাৎ পূর্ব-বৈদিক 'ওম্' ধাতু হতে নিষ্পন্ন। মারাঠীর ব্যুৎপত্তি কোথায় কোন পূর্ব-বৈদিক যুগে গিয়ে ঠেকবে তা এখন শাস্ত্রজ্ঞদের বিচারের বিষয়। অথবা ওঁব ধাতুর সম্বন্ধ সংস্কৃত 'বে'-র সহিত মানা যেতে পারে। কিন্তু তাতে 'ওঁব'-তে অনুস্বারের উপপত্তি খাটে না। ওঁবী (ছন্দ) যা মারাঠী ভাষার গায়ত্রীই বটে তা এই 'ওঁ' ধাতুরই রূপ। সকল বাঙ্‌ময় যে ছন্দে সহজে গ্রথিত করা যায় তা ওঁবী। ওঁ-কারের কল্পিত সাড়ে-তিন মাত্রার মত জ্ঞানদেব নিজ ওঁবীতে সাড়ে-তিন চরণের ব্যবহার করেছেন। উমা শব্দে এই ধাতু আছে বলে তার অর্থ হয়েছে বিশ্বব্যাপিনী দেবী। এই ধাতুতে 'বি' উপসর্গ যোগ করে পরম ব্যাপক আকাশের সূচক 'ব্যোমন্' শব্দ গঠিত। ল্যাটিনের 'অমনিস্' অর্থাৎ সর্ব অথবা বিশ্ব এই ওম্-এরই বিকৃতি। 'অমনিপ্রেজেণ্ট' ইত্যাদি ইংরেজী শব্দে ল্যাটিনের এই বিকৃতি দেখা যায়। এভাবে সব দিক থেকে দেখলে স্থিত-প্রজ্ঞের সকল বিশ্বের জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবাবস্থার সূচক রূপে ওঁ-রূপ মন্ত্রাবয়বের সৃষ্টি খুবই যোগ্য হয়েছে।

১৮০. দ্বিতীয় পদ তৎ। জ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তির জন্য চিন্তনীয়

দ্বিতীয় পদ 'তৎ'-এর অর্থ সে। যে সৎ নয় আর অসৎ নয় সে। মানে যে এখানে নয়, যে নিকটের নয় অর্থাৎ কল্পনার বাইরের। 'তৎ'-এর চিন্তন দ্বারা জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানাবস্থা সিদ্ধ হয়। 'তৎ ত্বং অসি' তুই-ই সে এই বাক্যে সে অবস্থা সূচিত হয়েছে। এই আবর্জনা জঞ্জাল, এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ তুই নস, তুই তার বাইরে, তুই সব কিছুর

ছোঁয়াচের বাইরে—'তৎ ত্বং অসি' এই বাক্য দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। সে-ই এই 'তৎ'।

১৮১. তৃতীয় পদ সৎ। ক্রিয়াবস্থার সিদ্ধির নিমিত্ত সেবনীয়

তৃতীয় পদ সৎ। এ ত স্পষ্টই। শুভ গ্রহণ করে অশুভ যে ত্যাগ করে সেই সৎ। 'সত্যের আগ্রহ, অসত্যের ত্যাগ' 'সৎ' এই ভূমিকার সূচক। সৎ মানে 'শুদ্ধ' ব্রহ্ম।

১৮২. একত্রে 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র ব্যাপক, অলিপ্ত এবং পরিশুদ্ধ জীবনের বাচক। যে কোন পূর্ণ বিচারের তা স্বরূপ

এরূপে 'ওঁ' দ্বারা ব্যাপক ব্রহ্ম, 'তৎ' দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম ও 'সৎ' দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্মের বোধ হয়। এই তিন পদ জ্ঞানী পুরুষের তিন অবস্থার দ্যোতক। এই তিন অবস্থা একেবারেই পৃথক পৃথক নয়। এই তিন অবস্থা মিলে জ্ঞানী পুরুষের যে একই জীবন রচিত হয় তা আমরা আগেই দেখেছি। ক্রিয়াবস্থায় সৎ প্রধান। ক্রিয়াই স্থূল জীবনের মুখ্য ভাগ। মানুষের ব্যক্ত, প্রকট জীবন ক্রিয়াত্মকই বটে। শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জীবন-চরিত লিখতে তাদের দ্বারা যে সব কার্য হয়েছে মুখ্যত তারই বর্ণনা করা হয়। কারণ ক্রিয়াই জীবনের মুখ্য দৃশ্য ভাগ। তদনুসারে 'সৎ'কে মুখ্য শব্দ বুঝতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণের ভাষায় তা হবে নাম (সংজ্ঞা)। 'ওঁ' ও 'তৎ'-কে তার বিশেষণ মনে করতে হবে। ক্রিয়াবস্থাকে মুখ্য মনে করে তাকে মণ্ডিত করার জন্য বাকী দুই অবস্থার দুই বিশেষণ ওতে জুড়ে দিতে হবে। উভয়-বিশেষণ-বিশিষ্ট

'সৎ' শব্দ,—অর্থাৎ 'ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্র (ওঁ মানে) ব্যাপক, ('তৎ' মানে) অলিপ্ত, ('সৎ' মানে) পরিশুদ্ধ—জীবনের দ্যোতক হবে। ব্যাপক, অলিপ্ত ও পরিশুদ্ধ অথবা সত্যময় মিলেই পূর্ণ জীবনের স্বরূপ। আর যে কোন পূর্ণ বিচারের অথবা পূর্ণ প্রয়োগের স্বরূপও তাই।

১৮৩. উদাহরণার্থ সত্যাগ্রহ

উদাহরণরূপে আমরা সত্যাগ্রহের স্বরূপ বিচার করছি। সত্যাগ্রহে সৎ-এর আগ্রহ ও অসৎ-এর বিরোধ সুস্পষ্ট। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করে অসত্যের প্রতিকার করতে গিয়ে বিশ্বাত্ম-ভাবনা যেন ভুলে না যাই। সামনে যে মানুষ দাঁড়িয়ে (প্রতিপক্ষ) সে আমারই রূপ এরূপ ব্যাপক বোধ অনুক্ষণ থাকা দরকার। নিজের হাতে কাঁটা ফুটলে যেরূপ কোমল মনে, কোমল হাতে তা তুলি ঠিক সেরূপ ভাব হতে অন্যের দোষ সংশোধন করতে চেষ্টা করব। ঐ কার্য বাহ্যত তার সংশোধনের মনে হলেও বস্তুত তোমারই সংশোধনের কায একথা মনে রাখতে হবে। রাগ করবে না, উত্যক্ত হবে না। যেখানে অশুভ দেখছ সেখানে শুভই বিদ্যমান—এটা বোঝ। সেই শুভের ফটক দিয়ে তার হৃদয়ে প্রবেশ কর ত অশুভের যথার্থ প্রতিকার করতে পারবে। ওঁ পদের দ্বারা একথাই বলা হয়েছে। যার প্রতিকার করতে চাও, যাকে তুমি অশুভ মনে কর, তারা সবই ঈশ্বরের রূপ এই ভাবনার মোহর তোমার প্রতিকার-প্রয়াসের ওপর পড়তে দাও—ওঁকার একথাই বলে। এটা সত্যাগ্রহের ভিত। এসব করার পরে, আমার বিজয় হয়েছে, আমিই করেছি এরূপ ভাব মনে আসতে দিও না। বাস্তবপক্ষে এ মরীচিকা। এসব খেলা একথা মনে রাখা দরকার। এসব থেকে তোমার ও তার প্রকৃত রূপ আলাদা। খেলার পাকে জড়িয়ে নিজেই জ্ঞানহারা হয়ো না। খেলা খেলাই থাকা

চাই। তা থেকে আমরা পৃথক একথা সদা মনে রাখা দরকার। 'তৎ' শব্দের দ্বারা এই অলিপ্ততার তত্ত্ব সূচিত করা হয়েছে।

১৮৪. ঐ সবই একত্রে জীবনে প্রযোজ্য

সত্যাগ্রহের উদাহরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ দিলাম। এটাই মনুষ্যজীবনের সর্বপ্রকার আচরণের সূত্র। বাবার সঙ্গে ছেলে, ছেলের সঙ্গে বাবা, গুরুর সঙ্গে শিষ্য, শিষ্যের সঙ্গে গুরু প্রভৃতি কি ভাবে চলবে তার সূত্র এই মন্ত্রে রয়েছে। এই মন্ত্রের তিন শব্দ একত্র করলে যে ভাব হয়, তা তার প্রত্যেক শব্দে রয়েছে এটা ধরে নিতে হবে। ধ্যানাবস্থার তত্ত্বের শুভাশুভ সংগ্রহকারী ভাগটা নিয়ে বাকী অংশটা বাদ দিলে জীবনের ব্যবহারের জন্য আবশ্যক যে বিবেক তাকেও বাদ দেওয়া হবে। শুভাশুভের অতীত জ্ঞানের ভূমিকা কেবল গ্রহণ করেন ত সকল কর্ম লোপ পাবে। কেবল শুভাশুভ-বিবেকের ক্রিয়াবস্থা মেনে নেন ত বিবেকের নামে অসংখ্য ভেদ খাড়া হবে, জীবন টুকরো হবে, ভেদ-সংকুল হবে। অতএব তিন স্বরূপ একত্র বিচার করে ক্রিয়ার ধরন ও স্বরূপ নির্ণয় করেন ত ক্রিয়া নির্দোষ হবে। এই তিনকে লক্ষ্যে রেখে এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন

১৮৫. উপসংহার—অর্জুনের প্রশ্নের আকার ও তদনুসারে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের প্রবাহ

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এখানে শেষ হল। কিন্তু অর্জুনের মুখ্য প্রশ্নের রূপ আর একবার লক্ষ্য করে দেখা যাক। তা হলে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের

প্রবাহ বোঝা যাবে। অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন এই—স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা কি ? ভাষা মানে ব্যাখ্যা। তদনুসারে একই শ্লোকে বিধায়ক ও নিষেধক মিলিয়ে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে ভগবান এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেই অর্জুন থামেন নাই। স্থিতপ্রজ্ঞ কিভাবে চলে, কিভাবে থাকে, কিভাবে চলে-ফেরে একথাও জিজ্ঞাসা করেছেন। তার বলার ধরন মধুর কি কঠোর, থাকার ধরন গরীবের মত কি মাঝামাঝি লোকের মত, চলার ধরন দ্রুত কি মন্দ—এভাবে ভগবান উত্তর দেন নাই। গোটা জীবন সামনে রেখে তিনি তিন প্রশ্নের অর্থ করেছেন। বলা, চলা, থাকা বলতে সমগ্র জীবনটাই আমরা ধরে নিই। আর উত্তরও দেওয়া হয়েছে তেমনটি ধরে নিয়েই। তা হলেও এই উত্তরে তিন প্রশ্নের অক্ষরার্থের ছাপ অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিভাবে বলে এই প্রশ্নের দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যাখ্যার স্থূল বিবেচনা অথবা তার প্রত্যক্ষ আচরণ জানার আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে, এরূপ ধরে নিয়ে তিন শ্লোকে তার উত্তর দিয়েছেন। তার প্রশ্নের নেহাত অস্পষ্ট ছাপ সূক্ষ্মদর্শী টীকাকারেরা, 'নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি' অর্থাৎ সে কিছুকে অভিনন্দনও করে না, কারো মন্দও চিন্তা করে না, এই শব্দচয়ে খুঁজে পেয়েছেন। কিভাবে সে থাকে এই শব্দ দ্বারা কিরূপে সে তার অবস্থায় পৌঁছেছে, সেই সাধনা কি, একথা জানতে চাওয়া হয়েছে ধরে নিয়ে দশ শ্লোকে উপপত্তিসহ তা বর্ণনা করা হয়েছে। 'কিমাসীত' এই প্রশ্নের ছাপ, 'আসীত মৎ-পরঃ'-এর উপর পড়েছে। শেষে 'কিং ব্রজেত' অর্থাৎ চলে-ফেরে কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞের বিহার-বর্ণনাকারী ত্রিসূত্রী বলা হয়েছে। 'পুমাংশ্ চরতি নিঃস্পৃহঃ'-এর চরতি শব্দে ঐ প্রশ্নের ইঙ্গিত রয়েছে বুঝতে হবে। সব মিলিয়ে অর্জুনের প্রশ্ন এরূপ দাঁড়ায়: (১) সমাধিতে স্থির আপনার যে স্থিতপ্রজ্ঞ তার নিষেধক ও বিধায়ক এই দুই রূপের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কি হবে ? (২) স্থিতপ্রজ্ঞের

প্রকট, প্রত্যক্ষ, সকলের সহজবোধ্য ও অনুকরণসুলভ লক্ষণ কি? (৩) কিরূপ সাধনসহায়ে ও কি উপপত্তি দ্বারা সে নিজেতে ঐসব লক্ষণ ফুটিয়ে তুলেছে? (৪) স্থিতপ্রজ্ঞের ইহলোকের জীবনযাত্রার অথবা লীলার স্বরূপের ভূমিকা কিরূপ হবে? অর্জুনের প্রশ্নের এরূপ ব্যাপক অর্থ করেন ত তার উত্তর থেকে ঠিক ততটাই অভীষ্ট অর্থ মিলবে।

অষ্টাদশ ব্যাখ্যান

এক

১৮৬. স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণের অনুভবসিদ্ধ ফলশ্রুতি

স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণ এখানে সমাপ্ত হয়েছে। অন্তিম শ্লোকে এখন ফলশ্রুতি বলা হচ্ছে। কিন্তু বহু বৃহৎ ধর্মগ্রন্থের ফলশ্রুতির মত এ ফলশ্রুতি ব্যর্থ নয়। গীতার পদ্ধতি এই। গীতায় সর্বত্র অনুভবসিদ্ধ, যুক্তিযুক্ত ও সুনিশ্চিত ফলশ্রুতি ধরা হয়েছে। এখানেও তেমনি শাস্ত্রীয় ফলশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

> এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
> স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥

"হে অর্জুন, এ স্থিতিকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। তা যার লাভ হয়েছে তা থেকে সে চ্যুত হয় না, মরণকালেও সেই স্থিতি যেমনটি তেমন বজায় থাকে আর তার ফলস্বরূপ সে ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করে।" শেষ শ্লোকে এই ফলশ্রুতি উপস্থিত করা হয়েছে।

১৮৭. 'স্থিতি' শব্দের মাধুর্য

'স্থিতি' শব্দ এখানে বৃত্তি হতে পৃথকত্ব সূচনা করছে। 'স্থিতপ্রজ্ঞ' কথায়ও এ শব্দই রয়েছে। 'বৃত্তি' ও 'স্থিতি' শব্দের ব্যবধান তাদের ধাত্বর্থের বিচার করলে অধিক স্পষ্ট হবে। 'স্থিতি'তে আছে 'স্থা' ধাতু। 'স্থা'র

মানে দাঁড়িয়ে থাকা। তাতে স্থিরতার, অচাঞ্চল্যের ভাব বর্তমান। বৃত্তিতে রয়েছে 'বৃৎ' ধাতু, তার মানে বৃত্তাকারে ঘোরা, ঘুরতে থাকা। 'বর্তুল' শব্দেও ঠিক ঐ ধাতু। বৃত্তিতে অস্থিরতা, এক জায়গায় তিষ্ঠে না থাকার ভাব আছে। মানুষের বৃত্তিসমূহ স্থায়ী নয়। তা বদলায়। জাগৃতি হতে সুষুপ্তি আসে আর সুষুপ্তির পরে স্বপ্ন। জাগ্রতাবস্থায় ক্রোধ-বৃত্তি, মোহবৃত্তি, আর কখনও বা উৎসাহবৃত্তি, নৈরাশ্যবৃত্তি এরূপ নানা বৃত্তিভেদের খেলা চলে। বৃত্তিভেদ অনেক হলেও যোগশাস্ত্রে তাদের পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ পাঁচ প্রকার বৃত্তি হতে আলগা হওয়ার নাম যোগ। তা সাধনের আট ধাপ নির্দেশ করা হয়েছে। তার অন্তিম ধাপ সমাধি অর্থাৎ 'ধ্যান-সমাধি'। তা বলে ধ্যান-সমাধি যোগ নয়। কারণ তাও এক বৃত্তিই বটে। হলই বা তা অন্তিম বৃত্তি, তবুও তা যোগ নয়। যোগ মানে সকল বৃত্তির অভাব বা আরও সঠিক ভাষায় বললে সকল বৃত্তির প্রভাবের অভাব। সমাধি মানে ধ্যান-বৃত্তির পরিপাক। অমনি তো মানুষের বৃত্তি বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ চঞ্চল কিংবা গতিমান, কিংবা শূন্য। সমাধিতে তা স্থির হয়। সত্য বটে যে স্থির বললেই 'স্থা' ধাতু এসে যায়, কিন্তু তা তৎকালস্থায়ী মাত্র।

১৮৮. আত্মজ্ঞান ও ধ্যান-সমাধিতে ভেদ—ধ্যান ছোটে

সমাধির প্রধান লাভ এই যে অন্য সব বৃত্তি দূর করে দিয়ে একমাত্র ইষ্টদেবের চিন্তন-বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে। ইষ্টদেবতাকে সকল শুভ গুণের আধার মনে করা হয় বলে চিত্তের ময়লা ধোওয়ার পক্ষে তার চিন্তন খুব সহায়ক। কিন্তু ধ্যানের সমাধিও কিছু সময় পরে ভাঙ্গে। ধ্যানসমাধিরূপ বৃত্তির ওপারে গেলে পর বৃত্তি-শূন্য স্থিরতা লাভ হয়। একেই যোগশাস্ত্রে 'প্রজ্ঞা' বলা হয়েছে। সেই প্রজ্ঞা স্থির হলে চিত্ত

সহজেই নির্মল, প্রসন্ন, শান্ত ও আত্মনিষ্ঠ থাকে। তাকেই 'ব্রাহ্মী-স্থিতি' বলে। এটাই স্থিতপ্রজ্ঞের সর্বক্ষণস্থায়ী সহজাবস্থা। সমাধির বৃত্তি আনতে হয়। তা থেকে ব্যুত্থান হয়। ব্যুত্থানের অর্থ চলন। এতে তেমন ব্যুত্থান নেই। এটাই ব্রাহ্মী-স্থিতি ও ধ্যান-সমাধির মধ্যে পার্থক্য। তা আমরা পূর্বে আরম্ভেই দেখেছি। এখানে তারই অধিক আলোচনা করা হল। ব্রাহ্মী-স্থিতি নিত্য। তা লাভ হলে আর চলন নেই। 'নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি'—পুনরায় মোহ হয় না। অন্য জ্ঞানের মত আত্মজ্ঞানে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয় না।

১৮৯. আত্মজ্ঞান ও অন্য জ্ঞানে ভেদ। অন্য জ্ঞান বোঝাস্বরূপ

জ্ঞান ও ধ্যানে তো ব্যবধান আছেই, আত্মজ্ঞান ও অপর জ্ঞানেও ভেদ আছে। ধ্যান কৃত্রিম। তা যত্নপূর্বক অবলম্বিত এক বৃত্তি। জ্ঞান তদ্রূপ কৃত্রিম নয়। তা যত্ন করে পাওয়া নয়। জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে এই পার্থক্য। কিন্তু অন্য সকল প্রকার জ্ঞানে ও আত্মজ্ঞানেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান আছে। আমি ভূগোল পড়লাম। পরীক্ষা হয়ে গেল। এখন আর সে জ্ঞানে দরকার নেই। ভুলে গেলাম। কাশীতে যখন ছিলাম যুক্তপ্রদেশের রেলগাড়ির সময়-পত্রের খোঁজ রাখতাম। এখন প্রয়োজন নেই। ভুলে গেছি। এ সব জ্ঞান বাহ্য বিষয়ের বলে বুদ্ধির ওপর বোঝাস্বরূপ হয়। যতদিন কাজে লাগে ততদিন বুদ্ধি সে বোঝা বহন করে। প্রয়োজন শেষ হয় তো ফেলে দেয়। এরূপ অবান্তর জ্ঞানের প্রকাণ্ড বোঝা বুদ্ধির ওপর চাপানোকে বিদ্যাবত্তার নিদর্শন মনে করা হয়। মহা বিদ্যাবত্তার মানে বুদ্ধির ওপর প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে তাকে কমজোর করা। এরূপ প্রচণ্ড বিদ্যাবত্তার ফলে বুদ্ধিতে জড়তা

ও স্থূলতা আসে। ভগবান করুন এরূপ মহা পাণ্ডিত্য যেন কারো লাভ না হয়। আত্মজ্ঞান তদ্রূপ নয়। আত্মজ্ঞান বোঝা নয়।

১৯০. আত্মজ্ঞান, ধ্যান ও অপর জ্ঞানের অধিক আলোচনা

ধ্যান সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর। আমরা উপমা দিই, দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয় স্পষ্ট করি, রূপকের ব্যবহার করি, চিত্র আঁকি এ সব ধ্যানেরই রূপভেদ। এক বস্তুতে আর এক বস্তু আরোপ করা ধ্যান। কোন সংকেতকে বস্তুর প্রতিনিধি মনে করাই ধ্যানের তত্ত্ব। অর্থাৎ ধ্যান এক বানানো জিনিস। কাগজ কলম দিয়ে 'আলমারি' অক্ষর কয়টি লিখছি আর ঐ অক্ষরে কাঠের আলমারির আলমারিত্ব আরোপ করছি —এর নাম ধ্যান। তাতে জ্ঞান বাড়ে না৷ সাহিত্যের বাইরে তার কোন স্বতন্ত্র উপযোগিতা নেই। অক্ষরের ঐ আলমারিতে ঘিয়ের ঘট রাখা যায় না। তা এক বস্তুর চিত্র বা প্রতীক মাত্র। বিভিন্ন ভাষায় এভাবে একই বস্তুর বিভিন্ন প্রতীক থাকে। কোন সংকেতকে বস্তুর প্রতিনিধিত্ব দেওয়া ত আসলে এক কৃত্রিমতাই। ধ্যানের ন্যায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বানানো না হলেও আত্মার বাইরের জ্ঞান বলে বুদ্ধির ওপর তার বোঝা পড়ে। এটা অমুক গাছ। অমুক অমুক এর গুণ-ধর্ম। তার ওপর ওসব আমি চাপাই নিই, একথা সত্য। অর্থাৎ ওসব বস্তু-জ্ঞান, কিন্তু বাইরের জ্ঞান। সেকথা এখানে আমার মনে রাখতে হবে। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তা নয়। তা বানানো নয়, তদ্রূপ বাইরেরও নয়। তাই একবার লাভ হলে তা বরাবরের মত থাকে। পরে তা নষ্ট বা মলিন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ ঐ জ্ঞান বৌদ্ধিক নয়, আত্মগত। আত্মায় ব্যাপ্ত হয়েছে। এখন আর তা কোন মতেই ছুটবার নয়। এরই নাম, "নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি"।

১৯১. ব্রাহ্মীস্থিতি অন্তকালেও টিকে থাকে

"স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি"—'অন্তকালেও এ স্থিতিতে থেকে' একথার মানে কি? অন্তকালেও ব্রাহ্মীস্থিতি টিকে থাকা চাই, কেউ কেউ এরূপ অর্থ করেন। মানুষের অন্তকাল কঠিন একথা স্বীকৃত। সে সময়ে নিজ স্থিতি বজায় রাখা সহজ কথা নয়। এত প্রয়াস দ্বারা যে স্থিতি লাভ হয়েছে তা যদি ঐ সময়ে অর্থাৎ অন্তিম সময়ে না টেকে তবে ত সবই মাটি। শেষ সময়ে গাড়ি যদি লাইন-চ্যুত হয় ত সবই বানচাল*। তাই আমরণ তথা মৃত্যুসময়েও ঐ স্থিতি বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার এই বিশেষ কথা এ বাক্যে বলা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থ ঠিক নয়। অন্তিম সময়ের গুরুত্ব ত আছেই। তার জন্য সাধকের শেষ পর্যন্ত সজাগ থাকতে হবে একথাও ঠিক। তাই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে প্রয়াণকালীন সাধনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেখানে একথাও বলে রাখা হয়েছে যে ঐ প্রয়াণকালীন সাধনা সম্ভবপর করার জন্য জীবনভর চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু এই সব সাধকাবস্থার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মীস্থিতির পক্ষে নয়। ব্রাহ্মীস্থিতির অনুভব ক্ষণিকের তরে হবে, আর কখন তা চলে যাবে, তাই তা টিকিয়ে রাখার জন্য সতত প্রযত্ন করা দরকার, পরিস্থিতি ত এই নয়। ব্রাহ্মীস্থিতি কিছু বৃত্তি নয়। তা নিরন্তর স্থায়ী অবস্থা। তাকে টিকিয়ে রাখার দরকার নাই। তা টিকে থাকারই। মরণকালকে লোকে বিকট মনে করে; সেই বিকট কালেও তা খসে না। 'অন্তকালেঽপি'-র অর্থ এই। স্থিতি শব্দের দ্বারা যে অর্থ সূচিত হয়েছে "নৈনাং প্রাপ্য

---

* মারাঠীর শব্দানুসরণে এই বাক্যটির অনুবাদ হবে—অন্তিম মুহূর্তে গাড়ি যদি লাইন-চ্যুত হয় ত তা হবে চূড়া হতে খাতে পতন।

বিমুহ্যতি” বাক্যের দ্বারা তার আলোচনা করা গেছে। আর সে কথাই আবার ‘স্থিত্বাস্যাম্ অন্ত-কালেঽপি’ বাক্যাংশ দ্বারা বিশদ করা হয়েছে।

১৯২. ব্রাহ্মীস্থিতিতে ‘যদি-তবে’-র স্থান নাই

ব্রাহ্মীস্থিতি সর্বক্ষণ থাকে, আপৎকালেও থাকে, মরণকালেও। অন্য জ্ঞানের মত তা ভুল হওয়ার নয়। কোন লোকের কি একটা অসুখ হয়েছিল। গুটিকয়েক ইংরেজির পরীক্ষা সে পাস করেছিল। দেখা গেল অনেক দিন কঠিন রোগ-ভোগের ফলে ইংরেজির জ্ঞান তার একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। কারণ, সে সব জ্ঞান আত্মার মাথার উপর চাপানো হয়েছিল। রোগে কমজোর হওয়ার দরুন বুদ্ধি তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঠিকই হয়েছিল। আত্মজ্ঞানের বেলায় তা নয়। লাখো জন্মেও তা লাভ না হতে পারে কিন্তু একবার লাভ হলে তা ক্ষয় হবার নয়। প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান যদি অন্তকালেও টিকে থাকে তবে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়, এরূপ ‘যদি-তবে’-র প্রসঙ্গ এখানে নেই। ‘যদি-তবে’-রূপ অর্থের স্থান এখানে নেই। একথা বলার জন্যই বস্তুত এই শ্লোক।

১৯৩. শংকরাচার্যের বিশেষ অর্থ উপযোগী কিন্তু অনাবশ্যক

শংকরাচার্য কথাটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ‘যদি-তবে’-র অর্থের ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য তিনি স্বতন্ত্র এক প্রকারের ভাষ্য করেছেন। অন্তকালে অর্থাৎ একেবারে অন্তিম মুহূর্তেও যদি এই স্থিতিলাভ হয় তবে মানুষ ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করবে, এরূপ অর্থ তিনি করেছেন। আচার্যের একথা ঠিক কিন্তু এই শ্লোকের শব্দ থেকে তদ্রূপ অর্থ বার

করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 'স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি' এই শব্দচয়ের মাধুর্য তাতে নেই। এ অবস্থা এমনি সুদৃঢ় ও [illegible] যে অতিবিকট বলে গণ্য অন্তকালেও তা পরাজয় স্বীকার করে না, বিচলিত হয় না, এরূপই ত শব্দার্থের ঝোঁক মনে হয়। আচার্যের অর্থ অনর্থ নয়, কিন্তু অর্থ শব্দ হতে দূরে চলে যায়। যে অর্থ ব্রাহ্মীস্থিতিকে টিকিয়ে রাখার প্রযত্ন করার আবশ্যকতার কথা বলে তাকে কেবল অর্থবাদ বলতে হবে।

দুই

১৯৪. গীতার পরম লক্ষ্য ব্রহ্ম-নির্বাণ। তাতেই জীবনের সার্থকতা

অন্তে 'ব্রহ্ম-নির্বাণম্ ঋচ্ছতি' বাক্যে ফলশ্রুতি ধরা হয়েছে। স্থিত-প্রজ্ঞের মতই 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' শব্দও গীতার বিশিষ্ট শব্দ। ব্রহ্ম-নির্বাণ মানে ব্রহ্মে মিলে যাওয়া, লয় হওয়া, লীন হয়ে যাওয়া। ব্রহ্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয় একথার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্ম আর কোথাও রয়েছে, তাতে লীন হওয়ার জন্য যেতে হবে। আমাতে ও ব্রহ্মেতে দেহাভিমানের দেওয়াল বাহ্যত খাড়া দেখা যায়। সেই দেওয়াল দূর হয়ে যাওয়াই ব্রহ্মে লীন হওয়া। ব্রহ্ম ত আমি আগে থেকেই। দেহাভিমানের প্রাচীর দূর করে ব্রহ্মাতে লীন হতে হবে, মিশে যেতে হবে এতেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা একথাই ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দ সূচিত করে। তাৎপর্য, গোটা জীবন, ব্যক্তিগত সংসার, সমাজ-সেবা, জ্ঞান-অর্জন, ধ্যান ইত্যাদি সব কিছুর সাধনাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, এই শব্দ দ্বারা গীতা একথাই সামনে ধরেছে।

১৯৫. ব্রহ্ম-নির্বাণের অর্থ দেহ ফেলে দিয়ে ব্যাপকতম হওয়া

ব্রহ্ম মানে বিশাল, ব্যাপক। সংকুচিত জীবন ছেড়ে ব্রহ্মরূপ হওয়া আমাদের লক্ষ্য। এক জীব হতে আর এক জীব বড়। তা অপেক্ষা তৃতীয় আরও বড়। জীবে জীবে এরূপ তর-তম ভাব আছে। তা হলেও ব্রহ্মের তুলনায় জীব নেহাত তুচ্ছ। যাই হোক, তবুও সে পরিমিত। এক সীমায় আবদ্ধ। সেই বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া, ব্যাপক হওয়া এটাই তার ধ্যেয়। সেদিকে প্রগতি করে চলা, উত্তরোত্তর ব্যাপকতর হতে থাকা, এটাই সাধনার দিশা। ব্যাপকতম স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার নামই ব্রহ্মনির্বাণ। সে অবস্থায় দেহের প্রাচীর দূর হয়ে যায়। এই দৃষ্টিতে দেখলে দেহ সাধকের সাধন। সাধনার পক্ষে কিছুকাল তা সহায়ক। পরে মানুষের স্থিতি যেমন যেমন ব্যাপক হতে থাকে তেমন তেমন সে দেহকে পিছে ফেলে এগুতে থাকে। এই ব্যাপকতার অভ্যাসের পক্ষে প্রারম্ভিক অবস্থায় দেহ সাধনস্বরূপ। কিন্তু প্রগত অবস্থায় পরে তা বিঘ্নরূপ হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞান, ধ্যান, উপাসনা, কর্মযোগ এই সবের পক্ষে আরম্ভে দেহ উপকারক। কিন্তু পরে এই সকলের পরিপাক বিশ্বব্যাপী সাক্ষাৎকারে হলে পর সব কিছু আত্মময় দেখাতে থাকে। এই অনুভূতির পরে দেহ অনুপযোগী হতে থাকে।

১৯৬. এই স্থিতিতেই লোক-সংগ্রহ পরিপূর্ণ হয়।

এই স্থিতিতে, বিশেষ করে এই স্থিতিতেই, তার দ্বারা লোক-সংগ্রহ হতে দেখা যায়। লোকের কাছে সে লোক-সংগ্রহ মহান্ মনে হয়। কিন্তু জ্ঞানী-পুরুষের নিজের দৃষ্টিতে তা মনে হয় অল্প। কোন জ্ঞানী-পুরুষ

মরলে আমাদের মনে হয় মস্ত ক্ষতি হল, এমন মহান্ লোক-সংগ্রহ হতে আমরা বঞ্চিত হলাম। তবুও তাঁর মৃত্যুতিথি পুণ্য-তিথি বলে গণ্য হয়। আমাদের কাছে তা পুণ্যতিথি মনে হয় না। তত্ত্বজ্ঞ সাধুরা আমাদের ওপর ঐ শব্দ চাপিয়ে দিয়েছেন আর নিঃশব্দে তা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু শব্দটি অর্থগর্ভ। বস্তুত তা পুণ্য-তিথিই বটে। জ্ঞানী-পুরুষের যথার্থ লোক-সংগ্রহ সেদিন থেকে আরম্ভ হয়। তার আগে যে লোক-সংগ্রহ চলছিল তা ছিল অতি অল্প। হলই বা জ্ঞানীপুরুষের তবু শরীর ত তাঁর এইটুকুই না ছিল! তার দ্বারা আর কত লোক-সংগ্রহ হতে পারে? কিন্তু শরীর দ্বারা হয় বলে তা প্রকট হয়, দেখা যায়। এই দর্শন-মোহের দরুন, জ্ঞানী পুরুষের শরীরপাত হলে আমাদের মনে হয় মস্ত বড় ক্ষতি হল। কিন্তু বিষয় ত আসলে এই যে সর্বভূতের সেবার পক্ষে এই শরীর শেষ পর্যন্ত বিঘ্নই হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭. সেখানে দেহ নাই, কারণ দেহের আবশ্যকতা নাই।

দেহ-প্রাচীর থাকতে সকল ভূতের সহিত পূর্ণ সমরস হওয়া যায় না। সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করার পক্ষে শরীরটাই বিঘ্ন হয়। অন্যের হৃদয় বোঝার পক্ষে আমাদের বিশিষ্ট হৃদয়ের অস্তিত্ব যতদিন সাধনরূপ ততদিন এ শরীর কাজের বস্তু। নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভবের দ্বারা অপরের অবস্থা আমি বুঝতে পারি বলে আত্মৌপম্যের সাধনা করার সুযোগ আমার মেলে। আমার হৃদয় যতদিন অন্যের অবস্থা বোঝার মাপকাঠি ততদিন শরীরের কাজ থাকে। কিন্তু সর্ব-ভূত-হৃদয়ের সাক্ষাৎকার হলে পর, তাদাত্ম্যের অনুভব হলে পর, বিশিষ্ট দেহ, বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-নিচয়, বিশিষ্ট মন, বিশিষ্ট বুদ্ধি, বিশিষ্ট হৃদয় সব বিশিষ্ট

বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উপাধিতে* পরিণত হয়। তাই এই সকল উপাধি ছিন্ন করে, দেহভাব দূর করে দিয়ে, সর্ব-ভূত-হৃদয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করা, অনন্তে লীন হওয়া, ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়াই অন্তিম ধ্যেয় হওয়া চাই। এরই নাম ব্রহ্ম-নির্বাণ।

তিন

১৯৮. বৌদ্ধেরা নিষেধবাচক নির্বাণ শব্দ বেছে নিয়েছে

এ থেকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম বাদ দিয়ে কেবল নির্বাণ শব্দ বেছে নিয়েছে। এর অর্থ এই যে বৌদ্ধদের কাছে নিষেধক ভাষা ভাল লেগেছে। মানুষ আমার-আমার ছেড়ে দিক, অহংরূপ ঘট ভেঙ্গে ফেলুক, নির্বাণ শব্দে একথাই সূচিত হয়। মানুষ মরে গেলে তার নামরূপ কলসী ভেঙ্গে ফেলা হয়। এ প্রথা হিন্দু-শাস্ত্র চালু করে দিয়েছে। এই বিধির মূলগত ভাব এই—এখন ত বলতে হবে যে সে মরে গেছে; ভাল, সত্যিসত্যিই তাকে মরে যেতে দাও। তার বাসনার ঘট ফুটো হয়ে যাক। তার আমিত্বের অবসান হোক। শরীর ভস্মসাৎ করার হেতুও তা-ই। বাবা মরল, তাকে কবর দিলাম। কবরে আম গাছ পুঁতলাম। তাতে আম হল। তখন বলি, আমার বাবার সমাধিতে এই আম হয়েছে। মাকে ক্ষেতে রাখলাম। লেবু গাছ বসালাম। এ লেবু আমার মায়ের হাড়ের সারে পুষ্ট হয়েছে। এই মোহ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যই দহন-ক্রিয়ার বিধি। এই দহন-ক্রিয়া এক মহান্ ভাবের নিদর্শন। মরে যে গেছে সে কোন-না-কোন রূপে আমায় আঁকড়ে থাক, এ মোহ কেন? আমাতে কি পরশমণির পরশ

---

* মারাঠীতে 'উপাধি' শব্দের অর্থ—ঝঞ্ঝাট, উপদ্রব, a troublesome person or thing.

লেগেছে যে আমাকে আঁকড়ে থাকলে তার জীবন সোনা হয়ে যাবে? মরার পরেও কোন-না কোন রূপে মানুষের অবশেষ কিছু থাকুক এভাব হতে তাকে সমাধি দিয়ে তাতে বেদী তৈরি করা হয়, নিদেনপক্ষে গাছ লাগানো হয় আর কিছু না হোক ত স্মৃতিফলক বসানো হয়—এ যেন, মরে যে গেছে তাকে ধরে রাখার প্রযত্ন। তাই দহনের পথ আশ্রয় করা হয়েছে। তা হলেও স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। পুড়িয়ে ছাই করেছ, বস্, সব শেষ—এরূপ নিষেধক ভাবের দ্যোতক বলে বৌদ্ধেরা নিষেধক শব্দ পছন্দ করেছে। মানুষের মোহ তার দেহের সাথে সাথে নষ্ট হোক, সে শূন্য হয়ে যাক, তাই বৌদ্ধেরা কেবল নির্বাণ শব্দই নিয়েছে।

১৯৯. বৈদিকদের ব্রহ্ম-নির্বাণরূপ বিধায়ক ভাষা ভাল লেগেছে।

বৈদিকেরা ব্রহ্ম-নির্বাণরূপ বিধায়ক (ইতিবাচক) শব্দ বেছে নিয়েছে। বৈদিকদের অস্তিবাচক ভাষা ভাল লেগেছে। কেন ভাল লেগেছে তা বিচার করে দেখলে উভয় দিকের ভাষার মাধুর্য ও অপূর্ণতা ধরা পড়বে। ভাষা সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারে না। ভাষার স্বরূপ এমনি বিচিত্র যে তা এক দিকে আলোকপাত করে ত অন্য দিকে করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি। তাই বিধায়ক (ইতিবাচক) ও নিষেধক (নেতিবাচক) উভয় ভাষার ভাব বিচার করে যা রোচে গ্রহণ করুন। মোক্ষকে অভাব-রূপে না দেখে ভাব-রূপে দেখা বৈদিকদের ভাল লেগেছে। আমরা নাশ হয়ে গেছি, শূন্য হয়ে গেছি, বলা অপেক্ষা আমরা ব্যাপক হয়েছি, অনন্ত হয়েছি, বলা ভাল, বৈদিকেরা এ দৃষ্টি থেকে দেখেছে। উল্টো, বৌদ্ধেরা বলে শেষ হয়ে গেছে বললে এমন আঁত্‌কে ওঠ কেন? একটু সাহস ধর। শূন্য হও। শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় দূর কর। আমি অনন্ত হব, ব্যাপক হব, সর্বময় হব, বলাতে

অস্তিত্বের মোহ রয়েছে তা দূর কর। তার উত্তরে বৈদিক বলে, ভয় ও মোহের কথা এখানে নেই। অনুভবের উল্টোটা ভাবতে যাই কেন? এ পর্যন্ত নানা সাধনা করে সব কিছু ছেড়েছি, আত্মনিষ্ঠ হয়েছি। জন্ম-মৃত্যু পিছনে ফেলে নিজের বাস্তবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছি। ধর্ম দ্বারা অধর্ম মেরেছি, ফলত্যাগ দ্বারা ধর্মকে জীর্ণ (আত্মসাৎ) করেছি, ঈশ্বরার্পণ দ্বারা ফল-ত্যাগকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছি, অন্তে অদ্বৈতানুভূতি দ্বারা ঈশ্বরকেও নিজের মধ্যে সমাবেশ করেছি, সেই আমি নাশ হয়ে যাব এ কি করে স্বীকার করব? সকল অবস্থা দূর করার পরে অবশিষ্ট যে আমি তা ব্যাপক হয়েছে, ব্রহ্মময় হয়েছে এ কথা বলাই ত ঠিক হবে।

২০০. বস্তুত দুইই এক।

কিন্তু মোক্ষকে ভাবরূপ বললেও তাতে নূতন কিছু জুড়ে দেওয়ার অভিপ্রায় বৈদিকদেরও নেই। পক্ষান্তরে বৌদ্ধেরা আত্মার অস্তিত্ব মানতে চায় না এরূপ মনে করা, আমার মতে, তাদের ভুল বোঝা হবে। এরূপ ভুল ধারণা অনেকের হয়েছে, বড় বড়দেরও হয়েছে। তবুও তা ভুলই বটে। আর যাই হোক, বৌদ্ধদের 'আমি' ভাষায় অরুচি। কিন্তু বাকী যা কিছু থাকল, তা নেই কি? তাই বুঝতে হবে যে এই ভাষা-ভেদের মূলে মুখ্যত রয়েছে রুচিভেদ। অর্থের দিক থেকে ত আমি এ দুইয়ে বিশেষ কোন ভেদ দেখতে পাই নে। 'আমি'-তে বৌদ্ধদের ভয়ানক অরুচি; সে ত ভাল কথাই। অনেক হীন অনুভবের কর্দমে কর্দমাক্ত 'আমি'-র প্রয়োজনই বা কি? আর সত্য বলতে, ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দে তাকে কোন স্থান দেওয়া হয়েছে কি? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন ত ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দ কেবল বিধায়ক নয়। নিষেধক অর্থ গর্ভে ধারণ করে তা বিধায়ক। উভয় অর্থের সংগ্রাহকরূপে গীতা তার পরিকল্পনা ও প্রয়োগ করেছে। ব্রহ্ম-

নির্বাণ বলাতে 'আমি' চলে গেছে। রয়েছে ব্রহ্ম। এতে ভয় পাওয়ার মত কিছুই নেই। শব্দই যেখানে ফেল হয় সেখানে শব্দ নিয়ে বিবাদ কেন? আমি ত গীতার ভাষায় বলব, "একং ব্রহ্ম চ শূন্যং চ, যঃ পশ্যতি স পশ্যতি", যে ব্রহ্মকে ও শূন্যকে এক দেখে সে দেখে। তাই ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দ দিয়ে সকল বিবাদের অবসান করা হয়েছে।

॥ এখানে স্থিত-প্রজ্ঞের দর্শন পরিপূর্ণ হল ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা ২ লাইন ৪—ধৈয্যমূর্তিব স্থানে ধ্যেয়মূর্তির হবে।

„ ৩ „ ৩—কাঠ „ কাঠি „

„ ৬ „ ১৩—…সহজ স্থিতির স্বরূপ তাতে আসে।— এই বাক্যের পরে

এরই নাম প্রজ্ঞা।— এই বাক্যটি বসবে।

„ ৮ „ ১২—প্রজ্ঞা তটস্থ। — এই বাক্যের পরে

বস্তুর যথাযথ স্বরূপ দৃষ্টে তা নির্ণয় দেয়।— এই বাক্যটি বসবে।

„ ৯ „ ৭—লোকের স্থানে লোকেরও হবে।

„ ৯ „ ৮—তার জন্য বুদ্ধির দরকার নাই. স্থানে

তার জন্য অশেষ বুদ্ধির দরকার নাই হবে।

„ ১০ „ ৫—নিশ্চিন্ত স্থানে নিশ্চিত হবে।

১৪ „ ৯—বাহ্য বিষয় হতে আলগা হলে স্থানে

বাহ্য বিষয় হতে চিত্ত আলগা হলে হবে।

„ ২৫ শেষ লাইন—মানসানী স্থানে মাণসনী হবে।

„ ২৭ লাইন ৪ ৫—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ শব্দে জোর-জবরদস্তির ভাব নাই।

স্থানে

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ শব্দে তেমন জোর-জবরদস্তি—ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা ৩২ লাইন ১৪—দুনিবার শব্দের পরে দাঁড়ি হবে।
(অনুক্রমণিকা ৩৬ দ্রষ্টব্য)

" ৩৩ " ৮—সাবধান থাকা চাই, ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল
স্থানে
সাবধান থাকা চাই কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল

" ৩৩ " ৯—সুযোগ পেয়েছে ত বিদ্বানদেরও টেনে নেয়'
স্থানে
সুযোগ পেয়েছে ত বিদ্বানদেরও তা টেনে
নেয়'—এ হচ্ছে তার ভাবার্থ হবে।

" ৩৮ " ২১—আবশ্যক স্থানে আবশ্যকতা হবে।
(অনুক্রমণিকা ৪৩ দ্রষ্টব্য)

" ৫০ " ৫—এখানেও তেমন,
স্থানে
এখানেও তেমন।—কমার স্থানে দাঁড়ি হবে।

" ৫২ " ৬—নয়ত সংসারে আমি আসক্ত হয়ে যেতাম
স্থানে
নয়ত সংসারে আমি নিশ্চয় আসক্ত ইত্যাদি

" ৬১ " ৭—ফেলে স্থানে ফেলেন হবে।

" ৭৮ " ১৪-১৫—স্থিতপ্রজ্ঞা স্থানে স্থিতপ্রজ্ঞতা হবে।

" ৮৭ " ৭—প্রতিফলিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

" ৯৩ " ১৪—'হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম'
স্থানে
'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম' হবে।

" ১০২ " ১৫—১১৮ পরিচ্ছেদের উপর-দুই-কথাটি বসাতে
হবে।
(অনুক্রমণিকা ১১৮ দ্রষ্টব্য)

পৃষ্ঠা ১০৯ ,, ১০—এর রাত ও তার দিন

স্থানে

এর রাত ত তার দিন হবে।

(অনুক্রমণিকা ১২৫ দ্রষ্টব্য)

,, ১২০ লাইন ৯-১০— ... থেকে নড়ে না,

স্থানে

... থেকে নড়ে না।— কমা স্থানে দাঁড়ি হবে।

,, ১২২ ,, ২১-২২—বাহ্য বিষয়ের ত্যাগ নয়, করতে হয় ত হৃদয়ের

স্থানে

বাহ্য বিষয়ের ত্যাগ নয়, করতে হয় তাকে হৃদয়ের ইত্যাদি।

,, ১৪৩ ,, শেষ লাইন—'মানবাব আকাঙ্ক্ষার রূপ'

স্থানে

'মানবী আকাঙ্ক্ষার রূপ' হবে।

,, ১৪৯ ,, ৭—ক্রিয়াবস্থার উপর ভাবনাবস্থার

স্থানে

ক্রিয়াবস্থার উপর ভাবাবস্থার হবে।

(অনুক্রমণিকা ১৭১ দ্রষ্টব্য)

,, ১৬৬ ,, ৬—এক বস্তুতে আর এক বস্তু আরোপ করা, ধ্যান।

স্থানে

এক বস্তুতে আব এক বস্তু আরোপ করার নাম ধ্যান হবে।

সর্বোদয় সাহিত্য

বিনোবা

১। গীতা প্রবচন (৩য় সং) — ১.২৫ নঃ পঃ
২। স্থিত প্রজ্ঞ দর্শন — ১.৫০ „
৩। প্রেমময় বাংলা ১.৫০ „
৪। সাধনা — .৫৬ „
৫। শিক্ষা বিচার — ৩.৫০ „
৬। গ্রামে গ্রামে স্বরাজ ২য় সং) — .২৫ „

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

৭। ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন (৩য় সং) — ১.২৫ „
৮। গ্রামদান — ১.০০ „
৯। যাত্রার পথে — .৯০ „

ধীরেন্দ্রনাথ গুহ

১০। বিনোবা (জীবনী) — ১.০০ „
১১। ভূদানযজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ — .২৫ „

গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি

১২। সর্বোদয় অর্থ ব্যবস্থা — ১.০০ „

নির্মলকুমার বসু

১৩। গান্ধীজী কি চান — .৭৫ „

নিরুপমা দেবী

১৪। ভূদান গাথা — .৬ „

মাখনলাল গুপ্ত

১৫। সারথি — .৩৭ „
১৬। মহাজীবন — .৩৪ „

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি

সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২